সম্পাদক
দীননাথ মণ্ডল
Website : www.kothabarta.in

সম্পাদক মণ্ডলী
রাজকুমার শেখ
মোঃ দাবিরুল ইসলাম, মহঃ ইনজামাম হাবিব

# ১ নং মির্জাপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়

## বেলডাঙ্গা চক্র, মুর্শিদাবাদ

বিদ্যালয় ভবন

গ্রানাইট পাথরের মূল ফটক

প্রবেশ পথ

মৎস্য চাষ

বিশুদ্ধ পানীয় জল

শিক্ষার্থীদের শরীর চর্চা

ভেষজ উদ্ভিদ

শৌচাগার (বালিকা)

নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার গ্রহণ

হাত ধোওয়া

মির্জাপুরের নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় যেন একটুকরো মরূদ্যান

সংবাদ প্রতিদিন

নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার পাচ্ছে মির্জাপুর নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়

পুবের কলম

গাছ পরিচর্যা

# দীননাথ মণ্ডল-এর লেখা
# পুস্তক ও সম্পাদিত পত্রিকা
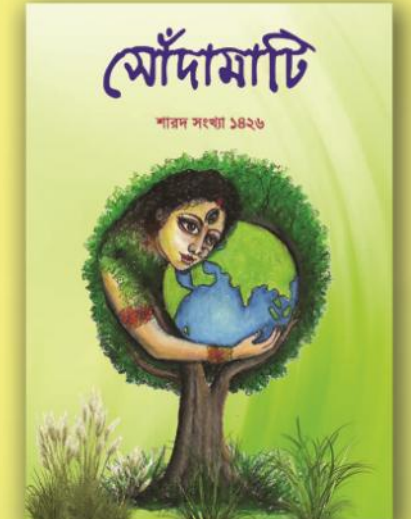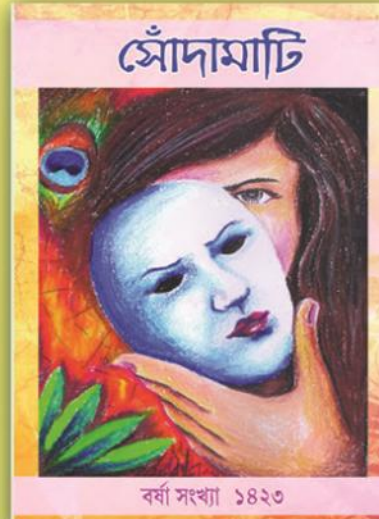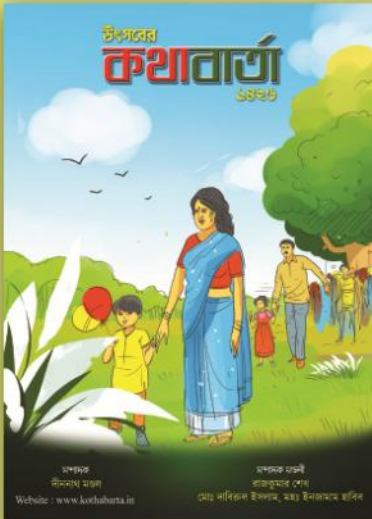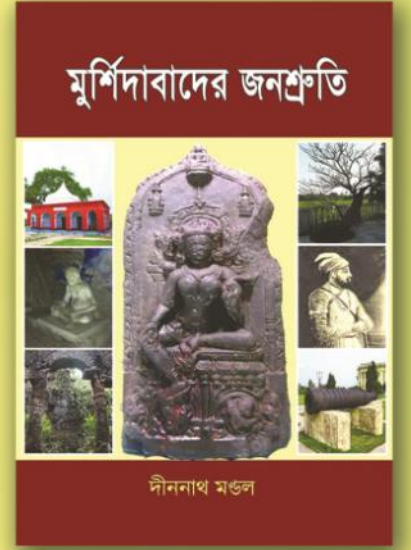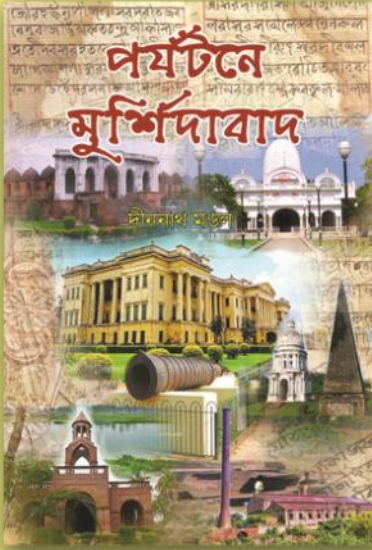
যোগাযোগ : M- 9153126613
website : www.dinanathmondal.blogspot.in
facebook : www.fb.com/shridinanathmondal

উৎসবের

# কথাবার্তা

১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৬, সেপ্টেম্বর ২০১৯

***Kathabarta, Utsab Sangkhya 2019 : A Collection of Literature***

প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৪২৬

সম্পাদক : দীননাথ মণ্ডল

সম্পাদক মণ্ডলী : রাজকুমার শেখ
মোঃ দাবিরুল ইসলাম
মোঃ ইনজামাম হাবিব

প্রচ্ছদ : নচিকেতা মাহাত

অলংকরণ : নয়ন সিংহ

পত্রিকা দপ্তর : বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৩

কথা : ৯১৫৩১২৬৬১৩ / ৮০০১১৭৬৪০৪
৯৭৩২৪৪৭০৮১ / ৭০০১৫৯১০২০

ওয়েবসাইট : www.kothabarta.in
মেইল : editorkothabarta@gmail.com
ফেসবুক : www.fb.com/kothabarta.in

কম্পোজ : ডি. মণ্ডল, মির্জাপুর, বেলডাঙা
প্রিন্ট : কলকাতা

*বিনিময় মূল্য : ৭০ টাকা*

# সূচিপত্র

## প্রবন্ধ

### প্রবন্ধ



### গল্প



### গল্প



### গল্প



### প্রাচীন কথা

# সম্পাদকীয়

আরও একটি শরৎকাল। প্রকৃতি সেজে উঠেছে নব সৃষ্টির খেলায়। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। সেই ছোঁয়া মানুষের মনেও। বৈরিতা ভুলে উৎসবের আনন্দে সবাই সামিল। বাঙালি নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে উৎসব প্রিয়তা। উৎসবের আমেজই বাঙালির প্রাণ। আকাশে মিলনে সুর। সেই সুরে আনন্দ। এই আনন্দের বন্ধনে ধ্বংস হোক গোঁড়ামি, বিচ্ছেদ, সংকীর্ণতা। ভেঙে যাক বিভেদের বেড়া। গড়ে উঠুক একপ্রাণ, এক সত্ত্বা - মানবতা। ধ্বনিত হোক ঐক্যবদ্ধ ভাষা। সেই ভাষায় ‘উৎসবের কথাবার্তা’র ছত্রে ছত্রে। নতুন আলো পত্রিকার ক্যানভাসে। সেই আলোয় বিশ্ব আলোকিত হয়ে উঠুক। আলোকিত হয়ে উঠুক মানুষ। সমাজ। জগৎ। আলোকিত হোক অন্তর। আলোতে ভেসে যাক বিশ্ব চরাচর। উৎসবে এই মহাপ্রস্তুতি আমাদের বিশ্ব প্রকৃতিও যেন মুখরিত হয়ে ওঠে। আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ‘উৎসবের কথাবার্তা ১৪২৬’। সমস্ত পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও সহযোগিতা না পেলে হয়তো এই সংখ্যা প্রকাশ করতে সক্ষম হতাম না। উৎসবের দিনগুলি মধুময় হয়ে উঠুক। আমরা আছি আপনাদের পাশে।

দীননাথ মণ্ডল

প্র|ব|ন্ধ

# নিশাত জাহান, ঘর ভাড়া ও একটি প্রশ্ন

**সুকুমার সরকার**

নিশাত জাহান কলকাতায় বাড়ি ভাড়া পায়নি। কারণ নিশাত জাহান মুসলমান। নিশাত জাহান গোঁড়া মুসলমান কি না আমরা জানি না। কিন্তু তার নাম যে মুসলমানি ভাষায়। অতএব ইসলাম ধর্মমতের গোঁড়ামি না মানলেও নিশাত জাহান ঘর ভাড়া পাবার অযোগ্য। আর এর পক্ষে বিপক্ষে তথাকথিত প্রগতিবাদী আমরা যারা তর্কের ঝড় তুলছি, এত যে উদারতার কথা বলছি; কই আমরা তো কখনো নিজেদের সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে কখনো আরবি ফারসি ভাষায় নাম রাখি না! কারণ আমরা ধরেই নিয়েছি, আরবি ফারসি ভাষা মুসলমানের ভাষা। ওই ভাষায় নাম মানেই সে মুসলমান। আর সংস্কৃত ভাষায় হলে ভারতীয় হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ অথবা জৈন ধর্মমতের মানুষ। নামের আদ্যক্ষরে না হোক, টাইটেলে ড্যানিয়েল, ড্রেভিড দেখলেই ধরে নেওয়া হয় খ্রিষ্টান। এসবের ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়; কিন্তু বেশিরভাগ চিত্রটা এইরকম। অর্থাৎ ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা জাতপাত, ধর্মমতের চিহ্ন এঁকে রেখেছি। আর সেই চিহ্ন দেখেই সহজে যে কেউ বুঝে নেই কে মুসলমান, কে হিন্দু বা কে খ্রিষ্টান। নিশাত জাহানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আর তাই, নিশাত জাহান ঘর ভাড়া পায়নি। এটা শুধু ওই ঘরওয়ালার দোষ নয়; দোষ আমাদেরও। আমরা যারা মুখে অসাম্প্রদায়িক বা উদারতার কথা বলেও বাস্তবে কোনো না কোনো বিশেষ ধর্মমতের ভাষা বা আচার আচরণের কাছে নিজেদের সংস্কারকে বন্ধক রেখেছি, দায়ি তারাও। কেননা, এই সংস্কারের বশে আমরা বলি, "হবেই তো, হবে না; দেখেছো তো বর্দ্ধমানে সাকিলারা ঘর ভাড়া নিয়ে কেমন জঙ্গিপনা করে গেল! তেমন যদি হয়। কী জানি বাপু, আই এস আই এর সঙ্গে যোগ রাখবে কি না কে জানে। দরকার কী! হিন্দু পেলে ভাড়া দাও নইলে দরকার নেই।" — পৃথিবীর কোন আইন এই কথার বিরুদ্ধে রায় দেবে?

শুধু বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে নয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই রকম বহুবিধ সমস্যা গোটা সমাজটাকে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। সমাজের বুকে দগদগে ঘা সৃষ্টি করছে! চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে! সবাই দুর্গন্ধের সঙ্গে বসবাস করার অভ্যাস করে নিয়েছি, কিন্তু প্রতিকারের জন্য কেউ এগিয়ে আসছি না।

ভাষা দিয়ে ধর্মমত বিচার করছি, মনুষ্যত্ব দিয়ে নয়! ধর্মমতের প্রশ্নে মনুষ্যত্ব ছাড়তে পারি কিন্তু ধর্মমত ছাড়তে পারি না। আর তাই ধর্মমতের আঁকা চিহ্নটাই পরে থাকব। বাঙালির ঘরে জন্ম হলেও বাঙালি মুসলমান হলে নিজের সন্তানের নামের ক্ষেত্রে রিমা, শ্যামলী, প্রিয়ঙ্কা যে নামেই ডাকি না কেন, আসল নামের ক্ষেত্রে কিন্তু উম্মে

কুলসম, তাবাসুম, ইবনে বিনতে জারা — এই রকমের একটা কিছু নাম রাখছি। হিন্দু হলে সংস্কৃত ভাষায় নাম রাখছি। কিন্তু কেন? প্রশ্নের উত্তর, "আমি মুসলমান বা আমি হিন্দু তা!" সুতরাং খুব সহজেই চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে কে হিন্দু বা কে মুসলমান। কিন্তু এইভাবে হিন্দুত্বের বা মুসলমানত্বের চিহ্ন সেঁটে রাখা কি আজকের যুগে খুব বেশি দরকার ছিলশ?

একদিকে উদারতার কথা বলবো, অন্যদিকে নিজের নামের সঙ্গে ভাষা দিয়ে হিন্দুত্ব বা মুসলমানত্ব বজায় রাখবো; এ হতে পারে না। আমাদের সকলকে এই ধরনের ভাষাগত সেন্টিমেন্ট থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে, এর সমাধান হবে না।

খাগড়াগড়ে যারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারা সন্ত্রাসী! হতে পারে তারা মুসলমান। কিন্তু তার সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা নিশাত তুলনীয় হবে কেন?

ইসলাম ধর্মমতের নামে আই এস আই — এর মতো ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি ভারতবর্ষের শিক্ষিত মুসলিম যুবক যুবতীদেরকে টার্গেট করছে ঠিকই। সেটা হিন্দু বা শিখ বা অন্য কোনো রিলিজিয়াসের যুবক যুবতীর ক্ষেত্রেও তো হতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিশাত জাহানই তেমনটি হবে কেন? এর উত্তর ওই ঘরওয়ালার কাছে যেমন নেই, তেমনি গোটা কলকাতার তথাকথিত আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের কাছেও নেই। কারণ আমরা সকলেই কোনো না কোনো ধর্মমতের ভাষাগত সেন্টিমেন্টের পোশাক পরে আছি। আগে ওই ব্যাধি দূর হওয়া দরকার।

জানি, তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এই কথার বিরুদ্ধে চড়া সুর ভাজবেন। কিন্তু সমাধানের পথে হাঁটবেন না। যাঁরা কবি সাহিত্যিক লেখার দ্বারা সমাজের সঙ্কীর্ণতাকে উদারভাবে তুলে ধরার কথা, তাঁরা বলবেন, সমাধান বাতলানো আমাদের কাজ নয়। সাহিত্যে সমাধান দেওয়া বঙ্কিমী-দোষ। সংবাদপত্র বলবে, সমস্যা তুলে ধরাই আমাদের কাজ। সমাধান দেওয়া নয়। রাষ্ট্রনেতোরা ভোট ব্যাংকের দিকে চেয়ে আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ করেন। সমাজ সংস্কারের ঝুঁকি তারা নিতে নারাজ। গদি টিকিয়ে রাখা তাদের লক্ষ্য। ধর্মমতের গুরুরা তো সিলমোহর সেঁটে দিয়েই গেছেন! অগত্যা সেই সিলমোহরই গায়ে সেঁটে আছি সবাই!

যাঁরা স্বঘোষিত তথাকথিত প্রগতিশীল, তাঁরা আন্দোলন করছেন সমকাম বিয়ে নিয়ে, আন্দোলন করছেন লিভটুগেদার নিয়ে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি রাখি, সমকাম দোষের না হলেও সমকাম বিয়েটা কি খুব প্রাসঙ্গিক? সমকাম বিয়েতে কিসের স্বীকৃতি থাকবে? যৌনতার, না বিবাহ পরবর্তী দায় দায়িত্বের?

আবার, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিবাহ যেখানে যৌন সম্পর্কের স্থায়ী রূপদানের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান সন্ততির উত্তরাধিকার ও দায়াধিকারের প্রশ্ন, সেখানে বিবাহ পদ্ধতির পরিবর্তে লিভটুগেদারের পক্ষে গলা ফাটানোটাও কি খুব দরকার?

প্রগতি বোধহয় ভুল পথে হাঁটছে! জানি আমার ধৃষ্টতা একটু বেশি অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তবু বলছি, আমাদের বোধহয় সময় এসেছে সঠিক পথ বেছে নেবার। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সভ্যতাকেও সমান তালে এগিয়ে নিতে হবে। পিছনের দিকে হাঁটলে চলবে না। কোনো রকম 'ভাষাগত সেন্টিমেন্ট', 'ধর্মমতগত সেন্টিমেন্ট' যেন মনের প্রগতিকে রুদ্ধ করতে না পারে, সেটা ঠিক করতে হবে।

নামের ক্ষেত্রে আরবি ফারসি ভাষা শুনলেই মনের মধ্যে যেন মুসলমান বা আই এস আই - এই ভাবনা বাসা না বাঁধে। আমরা যেন মনে রাখি ভাষার কোনো জাত হয় না। কোনো ভাষাই বিশেষ ধর্মমতের ভাষা নয়। পৃথিবীর কোনো ভাষাই একক কোনো ধর্মমতের জন্য নির্দিষ্ট ভাষা নয়! ওসব মানুষের কল্পনা। ধর্মমতের প্রবর্তকেরা নিজের নিজের ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ প্রমান করতে গিয়ে বলেছেন, অমুক ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরের বাণী। অমুক ভাষা ঈশ্বরের ভাষা। প্রশ্ন আসে, তাহলে অন্য ভাষাগুলি কি ঈশ্বরের ভাষা নয়? পৃথিবীর সব ভাষাই তো স্রষ্টার ভাষা। সব সৃষ্টিই তো স্রষ্টার সৃষ্ট। কোন ভাষা, কোন ধর্মমত, কোন জাতি তার সৃষ্টির বাইরে? আসলে দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্মমত নিয়ে সবাই বিভেদের রাজনীতি করে যে যেমন ভাবে পারে ফায়দা তুলছে। সেই মতো বিভেদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। প্রতিকারের কথা কেউ বলছে না।

বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি ফারসি শব্দ আছে। সারাদিন ঘরকন্নায় হাজারো আরবি-ফারসি শব্দ উচ্চারণ করছেন ওই ঘরওয়ালা পরিবার। তবু কেন 'নিশাত জাহান' শব্দটি শুনেই অমন সুচিবায়ুগ্রস্থ হয়ে পড়লেন ওই পরিবার? সত্যি খারাপ লাগে এটা ভেবে যে, আমরা কোন যুগে বাস করছি! এটা যে ধর্মমতের যুগই না, এই সত্য অনুধাবন করতে আর কতদিন লাগবে মানুষের। আমরাও বা কেন নিজের পরিচয়ে মধ্যযুগের ধর্মমতটাকে বড় করে তুলে ধরছি সেটাও বুঝে উঠতে পারছি না!

নিশাত জাহান একটি প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেছে, আমাদের তা সমাধান করতে হবে। নিজেদের পরিচয়ে সমস্ত রকমের ভাষাগত সেন্টিমেন্ট, ধর্মমতগত সেন্টিমেন্ট মুছে ফেলতে হবে। এটাই এই একুশ শতকের দাবি।

# বাংলার বেলদার জনগোষ্ঠী

**ড. গদাধর দে**

বেলদার ভারতবর্ষের এক ক্ষুদ্র জনজাতি। ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতিতে বেলদার হিন্দুকৃষ্টির বাহক হলেও বর্তমানে বহু মুসলমান বেলদার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক সময় মুসলমান কৃষ্টির মূল স্রোতে ভাসতে চাইলেও আজকে সরকারি সুবিধা প্রাপ্তির সুবাতে O.B.C. তালিকাতে More Backward (Category- A) শ্রেণি হিসাবে এরা জায়গা পেয়েছে (Notification No: 771- BCW/MR-436/1999 dt. 05-03-2010)।

আসলে বেলদার হল মাটি খননকারী রাস্তা প্রস্তুতকারী জাতি। আজও যেকোনো রাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত লোকদেরকেও অনেক সময় বেলদার বলা হয়। এটি একটি ফারসি শব্দ; বেল+দার। 'বেল' শব্দের অর্থ কোদাল বা খননযন্ত্র। ১৯৫১-এর সেন্সাসে মাননীয় আই.সি.এস. অশোক মিত্র ছিলেন সুপাররিনটেনডেন্ট অব সেন্সাস অপারেসেন্স। এখানে হিন্দু তপসিলি জাতি হিসাবে বেলদারকে বর্ণনা করে তিনি এদেরকে বিন্দনুনিয়াদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে বর্ণনা করে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজ কর্মে মৈথিলি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হবার কথা বর্ণনা করেছেন। এই হিসাবে উক্ত গ্রন্থের গ্রোসারি-এ সিডিউণ্ড কাপ্টস তালিকার বেলদার সম্বন্ধে মন্তব্যটি তুলে ধরা প্রয়োজন- Bel Means hoe. A wandering dravidian caste of earth worker and navvies. They carry earth on their head and never in Baskets slung from the shoulders. Allied to Binds and Nunias. Adult marriage still survives. Widow remarriage and divorce are allowed. Divorced women may also remarry. Social customs are much the same as of low classHindus of Bengal. Maithil Brahmans are employed. Status about the same as that of Nunias, Goras and Bauris. (page-70).

বেলদার জাতির এই জীবনধারা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সূত্র হিসাবে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীতে এগিয়ে যেতে পারি। যেখানে রাস্তা প্রস্তুতকারী মৃত্তিকা শ্রমিক রূপেই তাদেরকে দেখতে পাই–

একাযুত বেলদার আগে আগে ধায়।
উঁচু নিচু কুপথ সুপথ করে যায়।

(শ্রীধর্মমঙ্গল- ধনরাম, বঙ্গবাসী। তথ্য বঙ্গীয় শব্দকোষ - ২য় খণ্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাডেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃঃ ১৬১৮)

আরও এগিয়ে আমরা চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে যেতে পারি। সেখানে কৃত্তিবাসী রামায়ণে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) এই প্রাচীন জাতিকে দেখতে পাই বন কর্তনকারী রূপে–

"বেলদারে কাটে জত অরণ্য সকল।"

(তথ্য পূর্বোক্ত বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃঃ ১৬১৮)

১৯৫১ সেন্সাস থেকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু অর্থাৎ তপসিলি জাতি হিসাবে ১০৪৯ জন বেলদারের হিসাব পাওয়া যায়। জেলা ধরে দেখতে গেলে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে প্রাচীন স্থান অনুযায়ী সুজাগঞ্জে ১৫১ জন, জলঙ্গিতে ১৪ জন, সাগরদীঘি ও বদরীহাট মিলে ২৪ জন, সামসেরগঞ্জে ৩ জন বেলদারের অবস্থান দেখা যায় (মোট ১৯২ জন)। এরা হিন্দু না মুসলিম তা কিন্তু বোঝা যায় না। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দু বেলদারের পরিসংখ্যান নিতে গেলে শূন্য হাতে ফিরতে হবে। অথচ জঙ্গীপুর মহকুমায় ফারাক্কা অঞ্চলে সংখ্যাধিক মুসলিম বেলদারের অবস্থান লক্ষণীয়।

১৯৫১ সালে অশোক মিত্র হিন্দু বেলদারের পরিসংখ্যান দিয়ে গেছেন। এর পরবর্তীকালে ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার কথা খুব একটা অনুমান করা যায় না। O.B.C. সরকারি হ্যান্ডবুক থেকে জানা যায় তাদের মৃত্তিকাখননের কাজ এখন কবর খননে রূপান্তরিত হয়েছে। Other Backward classes in West Bengal, BCW Department- Govt. of West Bengal; (printed by Banerjee Enerprise, Kol-57, e-mail- banerjee.kt@ gmail.com) নামক সরকারি একটি হ্যান্ডবুকে এর ব্যাখ্যা কিন্তু পাওয়া যায়। যেখানে মুসলিম বেলদার সম্বন্ধে বলা হয়েছে তারা নুনিয়া থেকে ধর্মান্তরিত এবং আরও বলা হয়েছে ১৯৪০ সালের পূর্বেই তারা বাংলাদেশ থেকে চলে আসে। তারা যেকোনো মুসলিম পদবী ব্যবহার করে এবং চাষবাসের কাজসহ যেকোনো শ্রমসাধ্য কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাদের বেশির ভাগ এখন কুলিগিরি করে, মেয়েরা মিশির বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। দারিদ্র্যের কারণে অন্যান্য মুসলমান প্রতিবেশিদের সঙ্গে এদের বিয়ে চলে না। শিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে সাতমাসে গর্ভধারণীকে সাধ দেওয়া হয় এবং সাত রকমের মিষ্টি/ফল ইত্যাদি দেওয়া হয়। গর্ভধারিণীকে নতুন শাড়ি, অলংকার কসমেটিক্সে বিয়ের কনের মতো সাজানোও হয়। বিয়ের সাতদিন আগে স্নানের আগে বর কনেকে হলুদ মাখানো হয় এবং বিয়ের দিন বরকনে, আধ ঘন্টা অন্তর সাতবার স্নান করে। কনের বাড়িতে বরকে অভিবাদন করার সময় কন্যা পরিবারের সদস্যরা বরের উপর লবণ অন্ন ছিটিয়ে থাকে।

হিন্দুদের মতো অষ্টমঙ্গলাও তারা পালন করে। কবর খননের জন্য পুরস্কৃত করার নিয়মও বেলদারদের মধ্যে চালু আছে।

আমার মনে হয় হিন্দু বেলদারকে অশোক মিত্র নুনিয়াদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আজও নুনিয়াদের পদবী বেলদার পাওয়া যায়।

মুসলমান পীরকোদালী ও বেলদার আলাদা হলেও বর্তমানে এরা উভয়ে একই সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু শ্মশান ডোমের যা ভূমিকা এককালে পীরকোদালীদের তাই ভূমিকা ছিল; মৃতদেহ কবরস্থ করা। এক সময় কবর খননের কাজে বেলদাররাই বিশেষভাবে ডাক পেত।

সারা রাজ্যে হিন্দু বেলদারদের অবস্থান প্রধানত বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে লক্ষ্য করা গেলেও মুর্শিদাবাদে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় মুসলমান বেলদার। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমাতেই এদের সংখ্যা বেশি। পানের বরজে কাজ, দিনমজুর, মুটেগিরি, বিড়ি বাঁধা, ক্ষুদ্র ব্যবসা এই সবই তাদের জীবিকা। আর্থসামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে কোদালের কাজ, মাটি খনন বা কবর খননের কাজ থেকেও আজ তারা বিচ্যুত হয়েছে। জীবিকায় দেশের মূল জনস্রোতের তরঙ্গে অবগাহনের অপেক্ষায় আজ তারা প্রতীক্ষারত।

ছবি : ইন্টারনেট

# বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সহজিয়া গানে প্রান্তজন

**মধুসূদন মণ্ডল**

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় সহজিয়া গানের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সহজিয়া গান আসলে সহজিয়া গুরু বা সহজ গুরু দ্বারা রচিত গান। সহজিয়া গানে প্রকৃতপক্ষে সহজ গুরুদেব প্রাপ্তি উপলব্ধি বিষয়ক অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। এক অর্থে সহজিয়া সংস্কৃতি ও দর্শনের সাধারণ ভাবধারায় যারা আকর্ষিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকায়ত মানুষজনেরা। প্রান্তীয় বর্গের এই মানুষজনেরা সহজিয়া গুরুদের সান্নিধ্যে এসে বেঁচে থাকার জন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি নতুন মাত্রা খুঁজে পেয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সহজিয়া গুরুরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য গ্রহণীয় একটি সমন্বয়বাদী মতাদর্শের কথা বলতেন। ভক্তিবাদ হল আত্ম অনুভূতি ও মুক্তির একমাত্র পথ। এমনই অনুভূতি সহজিয়া গুরুদের চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

আবার ভক্তিবাদের আলোকেও 'সহজ' ও 'সহজিয়া' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সহজ হচ্ছে ভূমি, সহজের ভাব এবং আচরণ হল সহজিয়া। এক কথায় সহজ হল সাধ্য বস্তু ; যা সাধক বা ভক্তকে অর্জন করতে হয়, এবং সহজিয়া হল তারই সুনির্দিষ্ট সাধন প্রক্রিয়া, এই জন্যই বৈষ্ণব পদকর্তা বলেছেন,

"রাধা কৃষ্ণ এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ,
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
সহজ ও সহজিয়া তৈছে কভু নাহি ভেদ।।"

শ্লোকটির অর্থ অনুযায়ী সহজিয়া সাধনে ভক্তের অর্থাৎ সাধকের নির্বিকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, নির্বিকার চিত্তে নারী ও পুরুষ যেরূপে মৃত্যুর পূর্বের সময়কাল পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে পারে, তার অনুশীলনই হল সহজিয়া সাধন। এই জন্য বৈষ্ণবীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় 'সহজ' ও 'সহজিয়ার' মধ্যে কোন কল্পিত পার্থক্য চিহ্নিত করা হয় না। কেননা ভক্ত সহজিয়া সংস্কৃতি চর্চায় একই দেহে রাধা ও 'কৃষ্ণ' শক্তি অর্জন করতে পারে। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন যে,

"নাহি কাঁহাসো বিরোধ,
নাহি কাঁহা অনুরোধ সহজ বস্তু করি বিবেচন।"

অর্থাৎ কবিরাজ গোস্বামীর রচনাতেও সহজ বস্তুর আলোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রী চৈতন্যদেবের ভক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "হরি ভক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" অর্থাৎ স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও চাইতেন, আরো বেশি করে প্রান্তীয় বর্গের লোকায়ত মানুষজনেরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে 'কৃষ্ণ' প্রেমে মাতোয়া হোক, পরবর্তীকালীন সহজিয়া গুরুরা সেই বার্তায় তাঁদের ভক্তিমিশ্রিত সহজিয়া গানের মাধ্যমে আপামর লোকায়ত মানুষজনদেরকে দেবার চেষ্টা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সহজিয়া গানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করা যেতে পারে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তিবাদী যুগে ভক্তিবাদী সন্তরা তাঁদের সাধনার অনুভূতিকে সহজিয়া বিষয়ক দোঁহা গানের মধ্যে দিয়েও প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যের বিচারে এই ভক্তিবাদী দোঁহা গানগুলি মধ্যযুগের আঞ্চলিক সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ভক্তিবাদী সাধিকা মীরা বাঈ-এর তত্ত্ব অনুভুতির গান- "বিনা প্রেমসে নাহি মিলে কৃষ্ণ কাঁনাঞা।" সমাজের অন্তজন শ্রেণীর মানুষকেও গভীর দার্শনিকভাবে আচ্ছন্ন করেছিল।

একদিকে যেমন খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের নানা সংস্কার ও বিবর্তন ঘটেছিল, আবার বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। কেননা এই সময়কালে সনাতন হিন্দু ধর্মে আরো ব্যাপকভাবে ভক্তিবাদের প্রাবল্যতা দেখা গিয়েছিল, অনুরূপভাবে বৌদ্ধ ধর্মেও তন্ত্র ও যানের বিকাশ পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। এই সময় কালেই, বিকশিত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ, একটি হল হীনযান এবং অন্যটি হল মহাযান। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভেঙ্গে হয় বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম, বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্ম ভেঙ্গে হয় সহজযান বৌদ্ধধর্ম এবং সহজযান বৌদ্ধধর্ম ভেঙ্গে হয় সহজিয়া মতাদর্শ। পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাদর্শজনিত আন্দোলনের প্রভাবে বৌদ্ধ সহজিয়ারা বৈষ্ণব মতাদর্শের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া প্রায় প্রত্যেকটি মতাদর্শের ক্ষেত্রেই পুরুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি, মারিফৎ বা ফকিরী মতাদর্শেরও সহজিয়া সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুরুষ-প্রকৃতি ভাবনা বা আদম হবার ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী বৈষ্ণব বাউলেও এমন ভাবনার খবর পাওয়া যায়। এবার আমি সহজিয়া গানে প্রান্তজনদের ভূমিকার কথা আলোচনা করব।

নিম্নে কতকগুলি সহজ গানের উল্লেখ করলাম উক্ত গানগুলির মধ্য দিয়ে সহজিয়া সাহিত্যে প্রান্তজনদের প্রসঙ্গটি বার বার এসে যাবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়কালেও সহজিয়া গানের খবর পাওয়া যায়।

পরেশনাথ ব্রজবাসী একজন সহজিয়া গুরু। তাঁর গান রচনার সময়কাল বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। তিনি তাঁর ২২তম সহজিয়া বিষয়ক গানে আলোচনা করেছেন,

"পাল বংশে জন্ম মোর নাম হরিদাস।
পিতা মধুসূদন, ভক্ত, ভাই কৃষ্ণদাস।।
জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল।
মহাজনের বাণী নিয়ে সৎসঙ্গে চলো।।
ভাল কর্ম করা মন সাধ্য তব নয়।
ভক্ত সঙ্গে ভক্ত কৃপায় অনায়াসে হয়।।
ভক্ত হরিদাস সঙ্গে বেশ্যা ভক্ত হইল।
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন ফিরি গেল।।"

উপরের সহজিয়া গানটিতে এই কথা স্পষ্টভাবে সহজিয়া গুরু পরেশনাথ ব্রজবাসী ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি পাল বংশের মতো প্রান্তীয় বর্গে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি একজন ভক্ত অর্থাৎ হরি আশ্রয়ে আশ্রিত। এই জন্যই তিনি কুলের তুলনায় কর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার অনুরূপভাবে তিনি একথাও ব্যক্ত করেছেন যে, ভক্ত হরিদাস সঙ্গে লক্ষ হীরার যাবতীয় মলিনতাও দূর হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, চৈতন্য ভক্ত হরিদাস যবন বা অহিন্দু পরিবারে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি একজন পরম চৈতন্য ভক্ত হয়েছিলেন। আবার একেবারে প্রান্তীয় বর্গের মানুষজনও তাঁর ভক্তি প্রেমের ধারা বা কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিল। সেখানে লক্ষ হীরাও অবাঞ্ছিত ছিল না। আমরা 'রামায়ণ' মহাকাব্যেও দেখতে পাই নারদ সঙ্গে ব্যাধের সৎ জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল। কালক্রমে তিনিই হলেন মহামুনি বাল্মীকি। তিনিই রাম কথার উপর মহাকাব্য রচনা করলেন। সহজিয়া কবি পরেশনাথ ব্রজবাসী তাঁর আত্ম অনুভূতি বিষয়ক সহজিয়া গানে তাই পর্যালোচনা করেছেন। এখানেও বংশ গৌরবের চেয়েও কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আসলে ব্যাধ অর্থাৎ দস্যু রত্নাকর তো হলেন সেই মহাকাব্যের যুগের ভারতীয় সমাজের প্রান্তীয় বর্গেরই তো একজন মানুষ।

সহজিয়া মতাদর্শের মানুষজনেরা তাঁদের আত্মজনদের প্রতি ভক্তিভাব প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যক্ত করেছেন এক সহজ, সরল প্রেমানুভুতি। এমনি একটি কৃষ্ণদাস রচিত সহজিয়া গান হল,

"আমি জীব কৃষ্ণদাস, মধুসূদন পিতা,
পিতার অনুগত হলে, ঘুচবে সকল ব্যথা।
কি করে অনুগত হবো, কার ভক্তি বলে।
দাদা হরিদাস, হরিদাসের কৃপা পেলে।।
হরিদাসের কৃপা ছাড়া কৃষ্ণদাস নয়।
তাঁর কৃপা হলে দেখ বোবায় কথা কয়।
তাঁর আদেশ শুনলে, আর তাঁর বাক্য পেলে,
শান্তি মা সুখী হয়, জীবনে শান্তি মেলে।।"

এখানে পরস্পর ভাতৃত্ববোধ ও ভক্তিবাদী চেতনার উপর আত্মিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভক্তিবাদী

চেতনার দ্বারা আপ্লুত সহজিয়া গানগুলি সকল লোকায়ত মানুষজনকেই সহজভাবে আচ্ছন্ন করে।

অনুরূপভাবে মুরশিদ পীরের গানেও সহজিয়া বিষয়ক চিন্তাধারায় প্রান্তজনদের কথা গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। এমনি একটি মুরশিদ গান হল,

"হিন্দু মুসলমান খোদা কি বান্দা সব কহি কহি,
খোদা কায়ে লাভরে সে কই ছাই বান্দা হই,
খোদাকা ভজা দুনিয়া বিছমে –
আল্লাহ করয়ে পার কহত কবির যেই মাস
বাটুয়া সোনা এ তেরা পায়, হরদম আল্লাজীর
নাম মুরশিদ ভাবনা, মুরশিদ সে বেনা
আখেরে না হবে, জো এনানা হুত নাছত
মিসকো না জবরুন।।"

(উদ্ধৃতিটি সহজিয়া বিষয়ক কড়চা থেকে নেওয়া হল)

উল্লেখিত গানটির মধ্য দিয়েও সহজিয়া ভাবনায় গুরুবাদের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ পরম শক্তি বিনা মুক্তির অন্য কোন বিকল্প পথ নাই। কড়চাকার একথাই উল্লেখিত অংশে ব্যক্ত করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যেকেই তাঁর ভাবনার অংশ।

যেমন মনি গোঁসাই তাঁর আত্ম তত্ত্ব বিষয়ক গানে উল্লেখ করেছেন,

"হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ আর খ্রিষ্টান,
একই কূলে, একই বীজে, একই রাস্তায় গমন,
তুমি-আমি, নারী-পুরুষ দুটি ভিন্ন নয়
তবে কেন জাতের বিচার করো ভাই।"

এখানেও সমাজের সকলবর্গের মানুষজনদের উদ্দেশ্য আহ্বান জানানো হয়েছে যে, নারী ও পুরুষ ব্যতিত অপর কোন জাতি নেই, সকলেই মানুষ ধর্মের অংশ, অর্থাৎ মানবতায় হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

পরেশনাথ ব্রজবাসীর সহজিয়া গানেও গুরুবাদের দৃশ্যমান সমর্থন রয়েছে, তাঁর এমনই একটি সহজিয়া গান হল –

"শ্রী চৈতন্য স্বয়ং কর্ত্তা
রূপাশ্রিত ভট্ট রঘুনাথ,
কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রী মুকুন্দ চাঁদ,
মথুরানন্দ কালিনন্দ, গোস্বামী আনন্দ,
জগন্নাথ, গোবর্দ্ধন যুগোল কিশোর বন্দো,
সাধুচরণ, কাঙ্গালিচাঁদ গৌরচাঁদ গোঁসাই,
মদনানন্দ ফকিরচাঁদ, রামানন্দ গোঁসাই
তার প্রিয় ভ্রাত্য শিষ্য গোঁসাই ক্ষেত্রনাথ
তার শিষ্য পুত্র ভৃত্য আমি পরেশনাথ।"

উল্লেখিত সহজিয়া গান অনুযায়ী একথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, পরেশনাথ ব্রজবাসী হলেন, ক্ষেত্রনাথ গোস্বামীর শিষ্য। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলার লোকায়ত প্রান্তিক মানুষজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সহজিয়া চিন্তা ধারার দ্বারা আকর্ষিত। সেই জন্যই সহজিয়া সাহিত্য ও গানে সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন সামাজিক ভাবনাকে একটি অন্য মাত্রায় নিয়ে যেত সক্ষম হয়েছে। বিশেষত, বর্ণবাদী চিন্তাধারার উর্ধ্বে এটি ছিল একটি সামাজিক প্রতিবাদ। অন্যত্র এ বিষয়ে আরো পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

**তথ্যসূত্র :**

১। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি সহায়তায় উল্লেখিত নিবন্ধটি লেখা হল।

২। সহজিয়া বিষয়ক পুঁথি ও কয়েকটি লিখিত সূত্র ও উল্লেখিত নিবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

# শ্রমসঙ্গীত : লোকায়ত বঙ্গের লুপ্তপ্রায় ধারা

**কৌশিক বড়াল**

লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুষের সৃষ্টি। এর অন্তর্গত লোকসাহিত্য অশিক্ষিত লোকজন মুখে মুখে সৃষ্টি করে এবং সর্বক্ষেত্রেই তা ব্যক্তির সৃষ্টি, তবে মাঝেমাঝে দলগতভাবেও সৃষ্টি হতে পারে, যেমন কোন হেঁয়ালি, গীতিকা, প্রবাদ। কিন্তু ব্যক্তির সৃষ্টি হলেও কালের প্রবাহে যখন সেই সৃষ্টি একটি ব্যাপক জনসমাজের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখনই তা হয়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি। এইগুলি সাধারণত মুখে মুখে জন্মলাভ করে এবং মুখে মুখেই পূর্বপুরুষের কাছ হতে পরবর্তী পুরুষে চলে যায়, লালিত হয় এবং বেঁচে থাকে। মুখেমুখেই এগুলি এক দেশ থেকে অন্য দেশে ও এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে প্রবাহিত হয়। লোকায়ত জীবনের সমস্ত সাংস্কৃতিক-সামাজিক রেণু দিয়েই লোকসংস্কৃতির বিকাশ অর্থাৎ লোকায়ত জীবনকেন্দ্রিক যাবতীয় সৃষ্টি কর্ম ও চিন্তাভাবনার আবর্তনে লোকসংস্কৃতি আবর্তিত হয়।

লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সমাজ জীবনের দর্পণ। সমাজের সামগ্রিকতাই হল লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত অঙ্গণ। সভ্য সমাজের অত্যাধুনিক সভ্যতা যখন বাঁধভাঙ্গা অসভ্যের বিশ্লেষণে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন গ্রাম্য মিতভাষ নির্দ্বিধায় সৃষ্টির আনন্দে সারা প্রাঙ্গণ দাপিয়ে বেড়ায়। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এখানে নিরাকার। যেন বহুলাংশই আবশ্যিক। যেমন আবশ্যিক লোক। লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুষের সৃষ্টি। সমষ্টিগত জীবনপ্রয়াসে উদ্ভূত ও লৌকিক ঐতিহ্যে বিবর্তিত লোকসমাজের সজীব প্রবাহে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। ঐতিহ্যগত রসচেতনা ও শিল্প সচেতনতায় জারিত অনুশীলনমূলক কৃষ্টিই হল লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি অতীতের বয়ে আসা প্রবাহমান বিষয় হয়েও একটি জীবন্ত ধারা। লোকসংস্কৃতি জীবন্ত জীবাশ্ম, যার বিনাশ নেই।

মানব সংসার সদা কর্মময়। কোন কর্ম অধিক পরিশ্রমসাধ্য, কোনটি আবার কম পরিশ্রমের। এই পরিশ্রমকে লাঘব করার উপায় মানুষ নিরন্তর খুঁজে ফিরেছে। খুঁজতে খুঁজতে একসময় মানুষ পেল শ্রম লাঘবের পরশপাথর স্বরূপ গান। গান হয়ে উঠলো পরিশ্রম লাঘবের মূলমন্ত্র। শ্রমকে ভুলিয়ে রাখার গানের নামই হল 'শ্রমসঙ্গীত' বা 'কর্মসঙ্গীত' বা 'ক্রিয়া সংগীত' বা 'শ্রমের গান'।

শ্রমসঙ্গীতের মধ্যেও কল্পনা ও ভাববৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে। মূলতঃ নিম্নবর্গের মানুষজনের সৃষ্ট শ্রমসঙ্গীত কোনদিনই তথাকথিত ভদ্র সমাজে স্বীকৃতি পায়নি। এই গানের মধ্যে পাওয়া যায় মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা। কোন কোন গানে শ্লীলতা লঙ্ঘিত হলেও এর ছন্দ বা তাল সকল সময়ই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে শ্রমজীবী মানুষকে, ক্লান্তি ভুলিয়েছে মানুষের। বিশ্বায়ন ও যন্ত্রের আকছার ব্যবহারে শ্রমের হাতিয়ার ও শ্রমরীতির আমূল পরিবর্তনের সাথেই হারিয়ে যেতে বসেছে শ্রমের গান। প্রায় লুপ্ত শ্রমসঙ্গীতের কিছু নমুনা লোকসমাজে প্রকাশের অভিপ্রায়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

**ধান কাটার গান :** কৃষি প্রধান বাংলার আনাচে-কানাচে বর্ষাকালে ধান পোঁতার সময় চাষীরা নানারূপ আমোদে-প্রমোদে মেতে ওঠে। অনেকে গাল-গল্প বলে, অন্যেরা শুনতে থাকে। অপরদিকে, ধান কাটার সময় সমবেত কণ্ঠে চাষীরা গান গায়। যেমন-

সব্যাই মুরা ধান কাটি।<br>
পাশে থুই কাটা ধান পরিপাটি।।<br>
ধান মুদের জিন্দা-মরা, ধানই বারহ্যায় মান।<br>
ধান দিয়া হয় প্যাটের আহার, পড়হ্যার কাপুড় খান।।...

[ ***অর্থ*** ***:-*** সব্যাই – সকলে, থুই – রাখি, পুরিপাটি – পরিপাট্য, মুদের – আমাদের, বারহ্যায় – বাড়ানো, প্যাট– পেট, পড়হ্যার - পরিধানের। ]

**ধান ভানার গান :** এক সময় গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ধান ভানতে ঢেঁকির প্রচলন ছিল। সাধারণত গ্রামের মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানতো। এই সময় মেয়েরা সুর করে গান গাইতো-

ঢ্যাঁকিতে ধান ভাঙে গোলাপি সুন্দরী।<br>
শরিলে ঢেউ তুল্যে লাচেন বাহারি।।<br>
কখুনো ডাহিন পায়ে কখুনো বা বাঁয়ে।<br>
য্যানো গিদ্যারে ঢুলিয়া পড়ে আহা মরি মরি।।<br>
পিছনে চাপ দিল্যা পড়ে মাথাখানি তুলে।

চাপ আলগা কইরলে মাথা পড়ে ঢুলে।।...

[ *অর্থ :-* ঢ্যাঁকি – ঢেঁকি, শরিল – শরীর, লাচেন – নাচেন, ডাহিন – ডান, য্যানো – যেন, দিল্যা – দিলে, কইরলে - করলে। ]

**পালকি বইবার গান :** একসময় রাজরাজাদের পরিবারের মানুষজনের যাতায়াতের জন্য পালকি ব্যবহৃত হত। তাছাড়া, বিবাহ অনুষ্ঠানে পালকির ব্যবহার ছিল। পালকি চেপে পাত্র যেত বিয়ে করতে এবং বিবাহিত পাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পালকি চেপে বাড়ি ফিরতো। পালকিবাহকদের বলা হত বেহারা বা কাহার। বেহারারা পালকি বইবার সময় গান গাইতো। যেমন -

(১)

| | |
|---|---|
| হেইও রে... | হেইও রে |
| চারে বলে | হেইও |
| বারো পা | হেইও |
| আটে চলে | হেইও |
| পড়ে গেলে | হেইও |
| ভকাম করে | হেইও |
| কাত্ করে | হেইও |
| মারো জোরে | হেইও |
| কোলে করে | হেইও |
| ঠেলে ভরো | হেইও |
| জোরে টেপো | হেইও |
| জাপটে ধরো | হেইও... |

(২)

পালকি তুল, তুলরে কাঁদে
ধীরে নাইলে ঢুকবি খাদে
বাঁয়ে চল্ ডাহিনে মানা
হোছিস্ কেনে তালকানা
সামনে তাকা মাঠতো ফাঁকা
করিস নে লো বকাঝকা
ঢ্যামনা মাগি বেজায় ভারী
হেঁটে চল্ তাড়াতাড়ি
কাঁদ পালটাই দিসনি তাড়া
শূন্য এখন বিড়ির তারা
খাব জল খাব বিড়ি
জিরান নাইলে চলতে পারি
আর চলা লয় পালকি থামা
গাছের তলে মাগিকে নামা
প্যাট জ্বলে থামরে শালা
চাইয়্যা লাও সিধের ডালা

**পাট কাটার গান :** বাংলায় পাট চাষ বহুল পরিমাণে হয়। বড় পাটগাছে পর্যাপ্ত আঁশ হলে তা মজুর দিয়ে কেটে খাল, পুকুর বা নালায় 'জাগ' দেওয়া হয়। এই পরিশ্রমসাধ্য কাজ করার সময় মজুরেরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে-

চল কেদে দিয়া ভুঁই থেকে পাট কাইট্যা আনি।
মুর এয়েছে সুযোগ, ভুঁই থেকে নাইম্যা গেলছে পানি।।
কাটবু পাট দিবু জাগ খালের জলে নামি।
রোদ-গরুমে শরিল থেকে বেরুচ্ছে ঘাম-পানি।
ল্যাজ্জো মোজরি লিব রামবাবুর কাছে।
না দিলে মুরা কান্দি দিব সরকারের কাছে।।

[ *অর্থ :-* কেদে – কাস্তে, ভুঁই – জমি, মুর – আমার, গেলছে – গিয়েছে, গরুম – গরম, শরিল – শরীর, ল্যাজ্জো – ন্যায্য, মোজরি – মজুরী, লিব - নেব। ]

**ছাদ পেটানোর গান :** আগে কড়ি-বরগার ঘরে ছাদ হত চারকোনা বর্গাকার টালির উপর চুন সুরকির সাথে চিটেগুড় মিশিয়ে। সেই ছাদকে পোক্ত করার জন্য জল দিয়ে শ্রমিকেরা কাঠের বর্তুলাকার দণ্ড দিয়ে ছাদ পেটাতো। রোদে-গরমে অতি পরিশ্রমের ছাদ পেটানোর সময় শ্রমিকেরা ছাদ পেটার ছন্দে ছন্দে মজার গান গাইতো-

মুরা ছাদ পিটি ছাদ পিটি কাঠের পিটন্যা দিয়ে

আর পচা দ্যাখো মজা লুটে পরের বউ লিয়ে
মুরা ছাদ পিটি...
মুদের দুখের লাইগো শ্যাষ
দ্যাশ ছাইড়্যা চলি বিদ্যেশ
লিজের বউ দুখে থাকে পোলাপান লিয়ে
মুরা ছাদ পিটি...

**নলকূপ বসানোর গান :** নলকূপ বসানোর কাজটি যথেষ্ট পরিশ্রম সাধ্য। এই কাজে জোর দিতে পরিশ্রমকে ভুলে কাজে গতি আনতে নলকূপ বসানোর শ্রমিকেরা সমবেতভাবে ছন্দে-ছন্দে গান গায়। এই প্রকার গানে অশ্লীলতার প্রভাব বেশি থাকে। যেমন-

এই হেঁইলোস্সা — হেঁইয়ো
মারো টান — হেঁইয়ো
টানরে যোয়ান — হেঁইয়ো
সবাই মিলে — হেঁইয়ো
দেরে ঠ্যালা — হেঁইয়ো
আস্তে ভরো — হেঁইয়ো
ঠিকসে করো — হেঁইয়ো
ঢেমনি মাগি — হেঁইয়ো
মাই থল্ থল্ — হেঁইয়ো
ধরে টেপো — হেঁইয়ো
জোরসে টেপো — হেঁইয়ো
ফর্সা পোঁদ — হেঁইয়ো
ফাটুক পোঁদ — হেঁইয়ো
লম্বা দাঁড়া — হেঁইয়ো
পিছন মারো — হেঁইয়ো...

[ *অর্থ :-* যোয়ান – যুবক, ঢেমনি মাগি - অভদ্র মহিলা, মাই - স্তন, পোঁদ – পায়ুছিদ্র, দাঁড়া - পুরুষাঙ্গ। ]

**নৌকা বাইচের গান :** প্রাচীনকালে ব্যবসা-বাণিজ্য ও মাল পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম ছিল নদীপথ। নৌকা করে মালপত্তর ও মানুষজন আনাগোনা হত। মাঝিদের কর্মদক্ষতা পরীক্ষার জন্য দীঘি, নদী ইত্যাদিতে বিশেষ দিনে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। এই প্রতিযোগিতায় গতি বাড়াতে গাওয়া হত শ্রমসঙ্গীত। যেমন

ও লো মাঝি ভাই মারো টান — হেঁইয়া
জোরসে টানো — হেঁইয়া
দাঁড় টানো — হেঁইয়া
নৌকা চালাও — হেঁইয়া
দলের রাখতে মান — হেঁইয়া
করো জীবনপণ — হেঁইয়া
সবাই মিলে এক সাথে — হেঁইয়া
রাখো তবে গাঁয়ের মান — হেঁইয়া...

**রেল লাইন বসানোর গান :** রেলগাড়ি হল স্থলপথে যাতায়াতের অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রেললাইন স্থাপনার সময় অতি পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হয় শ্রমিকদের। লোহার ভারী ভারী রেলপাটি বসানোর পরিশ্রম লাঘব করতে শ্রমিকেরা কিছু গান গায়। যেমন-

এই হেঁইলোস্সা — হেঁইয়ো
রাম রাম বোলো — হেঁইয়ো
উপরে তোল — হেঁইয়ো
মাজা ডোলো — হেঁইয়ো
ছুঁড়ির চুঁচি — হেঁইয়ো
ফুলকো লুচি — হেঁইয়ো
তলা মারো — হেঁইয়ো
ডান্ডা ভরো — হেঁইয়ো
হাবুর বৌয়ের — হেঁইয়ো
লম্বা দুধ — হেঁইয়ো
দুধ ধরে ভাই — হেঁইয়ো
মারো রে টান — হেঁইয়ো
নিচের বাল — হেঁইয়ো
ঘষেনি সাবান — হেঁইয়ো
দু-তিন সাল — হেঁইয়ো
মাগির পোঁদে — হেঁইয়ো
ঢোকাবে জোরে — হেঁইয়ো
থলথলে পোঁদ — হেঁইয়ো
মারতে আরাম — হেঁইয়ো...

[ *অর্থ :-* মাজা – কোমর, চুঁচি – স্তন, তলা – যোনী, ডান্ডা – পুরুষাঙ্গ, বাল – যোনীকেশ, পোঁদ - পায়ুছিদ্র।]

বর্তমানে যন্ত্রের ব্যবহারের ব্যাপকতায় ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে শ্রমের আনুষঙ্গিক গান। সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন শ্রমসঙ্গীত শুধুই বইয়ের পাতাতে লিখিত থাকবে।

**ব্যক্তি ঋণ :**
১। ৺রায়পদ মণ্ডল, ৺সৈয়দ সেখ, ৺শ্যাম মণ্ডল (রাজমিস্ত্রি)
২। কাশেম সেখ, এক্রামুল সেখ (নলকূপ বসানোর শ্রমিক)
৩। কালু সর্দার, সনাতন সর্দার ( পালকি বাহক)
৪। বিভাস মণ্ডল, গোপাল মণ্ডল (কৃষক)
৫। অসীমা দলুই, নমিতা মণ্ডল (গৃহবধূ)
৬। আলাউদ্দিন সেখ, আব্দুল মজিদ (রেলশ্রমিক)
৭। ছবি : ইন্টারনেট

# ঈশ্বর চন্দ্র আলো আঁধার এবং নারায়ণ চন্দ্র

**সমীর ঘোষ**

এই সেদিন নগর কলকাতা বেদনাতুর ছিল- বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই বড়, মেজো সেজো আপামর বুদ্ধিজীবী ভাবনা আকুল! পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর মূর্তির নবরূপে প্রতিষ্ঠা সেও লক্ষ্য করা গেল। সারা দেশেই বেশ কিছুদিন উত্তেজনার পারদ চড়েছিল। শরম বিহীন আমরা দেখলাম সেদিন তাঁর মাথা ধুলোয় লুটোচ্ছে। অন্যদিকে স্মৃতির পুঁজিতে হাত পড়েছে বলে জনগন স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। অমিতবিক্রমী মানুষটির বেশ কিছু কথা বিশেষত বাঙালির মনে পড়লে আত্মম্ভরিতার বা শ্লাঘার শেষ নেই। অন্য পরিচয়ে আমরা আজ যেন বড়ই কাঙাল। স্মৃতির সরণি বেয়ে আজ তাঁর ধারপাশে ঘেঁষার ক্ষেত্রে বোধহয় বাঙালি অধুনা প্রায় রিক্তই! যাক আত্মগ্লানি নিয়েই তাঁকে একবার তাঁর জন্মের দুশো বছরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তাঁর শৌর্য আর আত্মগৌরব তথা চারিত্রধর্মের খন্ডতাই এই চিত্রায়ণ।
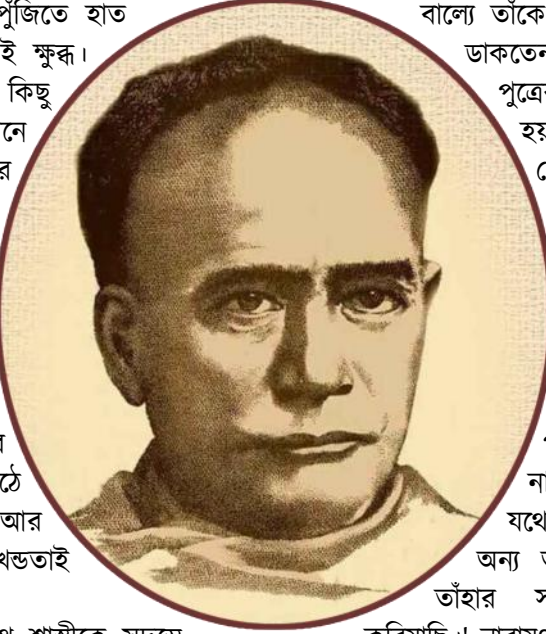
একবার বিদ্যাসাগর শিবনাথ শাস্ত্রীকে সদম্ভে বললেন 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিসুদ্ধ পায়ে টক করিয়া লাথি না মারিতে পারি'। সেই সময়ের প্রেক্ষিত ও এই উন্নত মেরুদণ্ডের মানুষটির এই উক্তিটি শোনাতে পারে বড় আত্মদম্ভী বলে। নেহাতই এটি কি তাঁর ব্যক্তি উচ্চাবকতার ভয়ংকর অহংয়ে স্ফারিত কি? অবশ্যই না। হত দরিদ্র এক গ্রাম্য পণ্ডিত যাঁর নিজের পোষাকআশাক নেহাত বাঙালিয়ানার ধুতি চটি লাঠি অতি সাধারণ কোনো ব্যক্তি মানুষকে আমরা এগুলির দ্বারা চিহ্নিত হতে দেখলে কোথাও একটা ভ্রান্তি বোধহয় থেকেই যায়। অথচ নবজাগরণের বিস্ময় পুরুষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনায় ঋদ্ধ। রক্ষনশীল এবং প্রগতিশীলের যে ঘূর্ণিঝড়, যে আবেগ, যে উচ্ছাস, তার সমস্তটাকে আত্মস্থ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই তিনি, এক অমিততেজা আস্তিক্যবাদী আধুনিক মানুষ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। এ সবই ঠিক। দয়ার কিংবা করুণার সাগর এও তাঁর আলোকিত পরিচয়। কিন্তু তাঁর আরও একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর একগুঁয়েমি তাও যেন কিরকম একটু অন্যরকম। তিনি যেটা বুঝতেন সেখানেই দৃঢ়বদ্ধ থাকতেন, থাকতেন আদর্শনিষ্ঠ। তার অন্যথা হোত না। তাঁর পারিবারিক বৃত্তে বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো।

বাল্যে তাঁকে তাঁর ঠাকুরদা 'ঘাড়কেঁদো' বলে ডাকতেন। এই অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁর পুত্রের ক্ষেত্রেও কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। এই পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্ররূপে ঘোষণা করেছিলেন। কেন অথবা কি কারণ এইসব বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে বরং এখন এই বিষয়ে তাঁর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যাক। পুত্রের সম্পর্কে এরকম উক্তি কি আকস্মিক? নিশ্চয় না। তিনি বলছেন, 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী, এজন্য ও অন্য অন্য গুরতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি।' নারায়ণ চন্দ্র বীরসিংহ গ্রামেই থাকতেন। পৌত্র নারায়ণ চন্দ্র সম্পর্কে ঠাকুর দাসের অতিরিক্ত অপত্য স্নেহ ছিল। তিনি তাঁকে কলকাতায় পাঠাতে চান নি। বীরসিংহ গ্রাম ছেড়ে ইতিপূর্বে ঠাকুর দাসের পঞ্চম পুত্র এবং তারও আগে হরচন্দ্র কলকাতায় পড়তে গিয়ে দু'জনেই কলেরায় মারা যান। দুই পুত্রের এই বিয়োগের ব্যথা তিনি ভুলতে পারেননি। পৌত্র নারায়ণ চন্দ্রকে তাই আর কাছ ছাড়া করতে চান না। বিদ্যাসাগর জোর করে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের বিদ্যালয় বিভাগে ভর্তি করালেও অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই পালিয়ে এলেন গ্রামে। গ্রামের পাঠশালাতেও তাঁর বিদ্যার দৌড় ১৫/১৬ বছর বয়স পর্যন্ত। ঐ পাঠশালাই বার বার পরীক্ষা দেন। বার বার ফেল করেন। পিতা ঠাকুর দাসের সঙ্গে পুত্র বিদ্যাসাগরের এ নিয়েও এক মন কষাকষি। এক সময়

ঠাকুর দাসের নিরামিষাশী পরিচয়কে বিদ্রুপ করতেও পিছপা হননি। বলেছেন, 'আপনি ঈশান ও নারায়ণ চন্দ্রের মাথা খাইয়েছেন, তথাপি আপনি লোকের কাছে কিরূপে আপনাকে নিরামিষাশী বলিয়া পরিচয় দেন!' ঈশান, ঈশ্বর চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের উপর পিতার চির জীবনের বিরাগ, বিচ্ছেদ এই কারণে ঈশ্বর চন্দ্রের জীবদ্দশায় তিনি তাঁর মুখ পর্যন্ত দেখতে চাননি। আরও আরও কারণ ছিল সন্দেহ নেই। ঈশ্বর চন্দ্রের জীবনীকারেরা সুনির্দিষ্ট ভাবে পুত্রকে এইভাবে পরিত্যাগ বা ত্যাজ্যপুত্র করে দেওয়া নিয়ে কিছু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টানে নি। তবে বিভিন্ন

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাতা ভগবতী দেবী

আলোচনায় যা দাঁড়িয়েছে তাতে এটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, নারায়ণ চন্দ্রের বিধবা বিবাহ একটি মুখ্য কারণ। ঈশ্বর চন্দ্র এমনকি এই বিবাহের পর থেকে আর নিজ গ্রাম বীরসিংহ মুখো একবারের জন্যেও হননি। এরপরও দীর্ঘ বাইশটি বছর তিনি বেঁচেছিলেন। তাঁর জগৎজননী ভগবতী দেবী সহ ভ্রাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সেই গ্রামে পড়ে থাকলেন। তাঁর এই গ্রাম পরিত্যাগের কথা বুকে বড়ো বাজলেও আদর্শ বোধ হয়

তাঁকে আরোও আপোষহীন করে তুলেছে। পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের বিধবা বিবাহে তাঁর নৈতিক অসমর্থনের কোনো জায়গাই ছিল না। তিনি প্রত্যয়ী ছিলেন যে, বিধবা বিবাহের তিনি পুরোগামী। তিনি তাঁর পুত্রের বিধবা বিবাহ চেয়ে ছিলেন। তাহলে? নারায়ণ চন্দ্র ত্যাজ্যপুত্র কেন হলেন? কেনই বা ছেলে সারাজীবনে পিতা পুত্রের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল। তিনি মা জননী ভগবতী দেবী বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে একাধিক পত্র লিখেছেন। বুকের ব্যথা বুকেই চেপে রেখেছেন। নারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে চির বিচ্ছেদের শেকড়ে যে এই বিবাহ তাও খোলসা করেননি। তাঁর পরিবারের সকলের এই বিবাহে আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এই বিবাহ দিয়ে দেন। কারণ কি অন্যত্র। বীরসিংহ গ্রামের সংলগ্ন ক্ষীরপাই গ্রামে মুচীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনমোহিনী নামের এক বালবিধবার বিয়ে স্থির হয়। মুচীরাম ছিলেন গ্রামের হালদারের ধর্মপুত্র। হালদারেরা বিয়ের আগে এসে ঈশ্বর চন্দ্রকে ধরলেন। তিনি তখন বীরসিংহ গ্রামে ছিলেন। তিনি হালদারদের কথা দিলেন এ বিয়ে হবে না। কিন্তু তাঁর কথার কোন মূল্যই থাকল না। এই বিয়ে তাঁরই নাকের ডগায় মাঝ রাতে তাঁর অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হল। তাঁর ভাইয়েরা বিশেষভাবে দীনবন্ধু এবং পুত্র নারায়ণ চন্দ্র এই বিয়েতে সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হল। কেউ কেউ বলছেন এই একাধিক ঘটনা তাঁর মনে প্রচণ্ড বিরক্তি আর সংসার নিস্পৃহতার তথা বৈরাগ্যের কারণ। পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্ররূপে ঘোষণা করে জন্মভূমি বিবাগী হয়ে তিনি কি শান্তি পেয়েছেন। লক্ষ্য করি মা ভগবতী দেবীকে লেখা সমকালে একটি পত্র। অক্ষরে, বাক্যে বেজেছে বেদনাবোধ -'আর আমার ক্ষণকালের জন্যে সাংসারিক কোনও বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারা সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই..... এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের অপরাধ মার্জনা করিবেন'। আবার নিজ

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর পত্নী দীনময়ী দেবী

পত্নী দীনময়ীকে অন্যত্র লিখছেন, 'তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখন কোনো দোষ বা অসন্তোষের কাজ করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষনাবেক্ষণ করিবেন।' প্রশ্ন জাগে পুত্র নারায়ণ কি তবে তাঁর মা ও ঠাকুমার পক্ষপুটে প্রশয় লালিত ছিল? বিদ্যাসাগর পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করার পরেও তাঁদের এই প্রশয় বিদ্যাসাগরকে বেদনামথিত ও ক্ষুব্ধ দুটোই করেছিল এবং তাই তাঁর জন্মভূমির সাথে চির বিদায়ের কারণ?

*ছবি : ইন্টারনেট*

# লুপ্তপ্রায় কতিপয় পেশা ও বিপন্ন সংস্কৃতি

**অর্ণব বড়াল**

যাযাবর মানুষ একদিন বসতি স্থাপন করেছিল। তারপর একে একে পরিবার, সমাজ গড়ে তুলেছিল। এরপর প্রয়োজন বোধ হয়েছিল নিত্যদিনের জিনিসপত্রাদির। তাই সমাজকে টিকিয়ে রাখতেই সমাজবদ্ধ মানুষ নিজেদের বিভিন্ন ধরনের পেশার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিল। এভাবেই একদিন কর্ম-পরিচয় থেকে জাতি পরিচয় তৈরি হয়েছিল। স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কংসবণিক, কর্মকার, সূত্রধর, প্রামানিক, ঘোষ, পাল ইত্যাদি পদবী পূর্বপুরুষের পেশার সাক্ষ্য বহন করে। বলাবাহুল্য জীবনের জন্যই জীবিকা। এই জীবিকা প্রয়োজনের তাগিদেই জন্মলাভ করে। আবার সময়ের সঙ্গে বহু পেশার লোপ হয়। বাধ্য হয়ে মানুষ তার সাতপুরুষের পেশাকে ত্যাগ করে নতুন পেশা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে। সেইরকম হারিয়ে যাওয়া কিছু পেশা ও পরম্পরা নিয়ে এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ।

**বেহারা :** পূর্বে জমিদার, অভিজাত ব্যক্তিরা যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে 'পালকি' ব্যবহার করতেন। এই পালকি যাঁরা বহন করতেন তাঁদের 'বেহারা' বলা হত। 'বিবাহযাত্রায়' পালকির ব্যবহার খুব প্রচলন ছিল। বনেদি পরিবারে তো পালকি অপরিহার্য ছিল। এই পালকির প্রচলন আজ আর নাই। ফলতঃ বেহারাগণ তাঁদের পরম্পরাগত পেশা হারিয়ে চাষাবাদ কিংবা নতুন পেশায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন।

**সেথো :** 'সেথো' আরেকটি অন্যতম লুপ্ত জীবিকা। 'তীর্থসাথী' থেকে অপভ্রংশ হয়ে সেথো শব্দটির উৎপত্তি। অতীতে অধিকাংশ মানুষ বয়স্ককালে তীর্থ ভ্রমণে বের হতেন। তাঁদের পথের সহায়ক যাত্রী হতেন এই সেথোরা। সেথোরা পথ প্রদর্শনের পাশাপাশি যাত্রীদের নানারকম ভক্তিমূলক গান, ছড়া, রঙ্গরসিকতা প্রদর্শন করে মনোরঞ্জন করতেন। বর্তমানে 'ভ্রমণ সংস্থা'র বাড়বাড়ন্ত এদের জীবিকা হরণ করে নিয়েছে।

**বরাতি :** গত শতাব্দীতেও মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল। শ্বশুরবাড়িতে এই অল্প বয়সী মেয়েদের পাঠিয়ে বাপ-মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। নতুন শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের সঙ্গে বরাতিদের কিছুদিনের জন্য পাঠানো হত। বরাতিরা ঐ নববধূকে সাংসারিক কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে ফিরতেন। মূলতঃ মহিলারাই 'বরাতি' পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে টেলিফোন, মোবাইলের রমরমা এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের পেশায় থাবা বসিয়েছে; কাজ হারিয়েছেন বরাতিরা।

**বহুরূপী :** এই পেশার বৃত্তিধারী মানুষরা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বা সাজগ্রহণ করে জনসাধারণের মনোরঞ্জন করেন। এতে তাঁদের রুজি হত। তবে বর্তমানে লোকজন এঁদের ভিখারী চোখে দেখে। রোজকার আগের মতো আর হয় না। তাই বহুরূপী শিল্পীরা আস্তে আস্তে এই পেশা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন; হারিয়ে যেতে বসেছে এই পেশাটিও।

**বাঁইচাদার :** এঁরা গৃহস্থের বাড়ি থেকে ধান সংগ্রহ করে চাল তৈরি করতেন। তারপর গৃহস্থকে ঐ চালের কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে ফেরত দিতেন। এই বৃত্তিধারী মানুষগুলিকে বাঁইচাদার বলা হত। এখন বাঁইচাদার বৃত্তির মানুষ তেমন নাই বললেই চলে। এই পেশা আজ লুপ্তপ্রায়।

**লাঠিয়াল :** একসময় রাজা, নবাব, জমিদার এমনকি অভিজাত ব্যক্তিরা তাঁদের সুরক্ষার জন্য পেশাদার লাঠিয়াল রাখতেন। চলতি ভাষায় এদের 'লেঠেল' বলা হত। মনিবদের রক্ষার কাজে এবং তাঁদের আদেশ পালনে লাঠিয়ালরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। তবে আধুনিককালে রাজা-জমিদারগণ বিদায় নিয়েছেন; তাঁদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে লাঠিয়ালও তাদের বৃত্তি হারিয়ে অন্য জীবিকা গ্রহণে করতে বাধ্য হয়েছে।

**মাহুত :** একদিন ছিল যেদিন রাজা জমিদার এবং ধনী ব্যক্তিগণ হাতিতে চেপে সওয়ারি করতেন এবং শিকারে যেতেন। এই হাতির তত্ত্বাবধায়ককে 'মাহুত' বলা হত। এই মাহুতের নির্দেশে 'হাতি' ওঠবোস করত। বন্যপ্রাণী আইন প্রণয়ন এবং রাজা-জমিদার প্রভৃতিদের অবলুপ্তির ফলে 'মাহুত'দের সচরাচর দেখা মেলে না। চিড়িয়াখানায় অতি অল্প মানুষ বর্তমানে এই পেশায় নিযুক্ত।

**সহিস :** ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচর্যা যিনি করেন তাঁকে সহিস বা সইস বলা হয়। পূর্বে রাজাবাহাদুর, নবাব-বাদশাগণ, অভিজাত ব্যক্তিবর্গরা ঘোড়া এবং ঘোড়ায় টানা গাড়িতে সওয়ার করতেন। সেই ঘোড়াকে তালিম দেওয়ার জন্য সহিসদের প্রয়োজন হত। বর্তমানে বন্যপ্রাণী আইন প্রচলন হওয়ার ফলে এবং ঘোড়াগাড়ি তুলনায় অধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন বাজারে এসে গেছে। ফলে সহিসরা তাঁদের কাজ খুইয়েছে এবং অন্য পেশা গ্রহণ করেছেন।

**ডোম :** সাধারণতঃ এরা নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্মশানে মৃতদেহ পৌঁছানোর পর দাহকার্যের যাবতীয় ব্যবস্থা এঁরাই নিপুণভাবে করতেন। তবে বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লি প্রচলন হওয়ায় এঁদের প্রয়োজনীয়তা একেবারে নাই বললেই চলে। ফলে তাঁরা বংশানুক্রমিক পেশা হারিয়ে অন্য পেশাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন।

**ঢুলি :** ঢোলের বাজনাদারকে ঢুলি বা ঢোলী বলা হয়। পূজা -পার্বণে ঢাক আর ঢোলের সমবেত বাজনা অনুষ্ঠানকে মুখরিত করে করে দিত। বর্তমানে বৈদ্যুতিক বাজনার দাপট আর ঢোলের প্রতি তীব্র অনীহা যুগপৎ কারণে পূজামণ্ডপে ঢোলের বাজনা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। ঢুলিরা তাদের সনাতন পেশা ছেড়ে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছে।

**ঢাকি :** ঢাকের বোলের মধ্য দিয়ে পূজা পূর্ণতা পায়। একসময় ঢাকের আওয়াজে মন্দির প্রাঙ্গণ কল-কল্লোলিত হত। তবে এখন আর বাজানদার বা ঢাকিদের কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। তাই বিভিন্ন রাগের বাজনা আজ আর শোনা যায় না। এক সময় ঢাকিরা বিজয়, মল্লার প্রভৃতি রাগের বাজনা বাজাতেন। এই নিয়ে তাঁরা চর্চা করতেন। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম তা শুনতে চায় না। ফলে ঢাকিরা এই বৃত্তি হারানোর ভয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

**অগ্রদানী :** একসময় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের সবিশেষ কদর ছিল। কারণ এঁরা যতক্ষণ না পিণ্ড গ্রহণ করতেন ততক্ষণ শ্রাদ্ধ কাজ শেষ হত না। বর্তমানে ব্রাহ্মণগণ এঁদের গুরুত্ব না দেওয়ায় এঁদের ভূমিকা কমেছে। তাই এঁরা অন্য পেশায় ঝুঁকছেন।

**গাড়োয়ান :** গরুর গাড়ি চালককে গাড়োয়ান বলে। একদিন এই গরুর গাড়ি যাত্রী ও মাল পরিবহনের অন্যতম যানরূপে ব্যবহৃত হত। তবে অধুনা যন্ত্রচালিত যানবাহনের দাপটে এই গরুর গাড়ির কদর আর নেই। গাড়োয়ানদের সেই পসার আজ আর নেই। তারাও আজ অন্য পেশার কাজে লিপ্ত।

**টোলপণ্ডিত :** পাশ্চাত্য শিক্ষার রীতিনীতি এদেশে প্রচলিত হওয়ার পূর্বে টোলে পঠন পাঠনের রীতি ছিল। টোলের শিক্ষকদের পণ্ডিত বলা হত। মূলতঃ ধনীব্যক্তি, জমিদার এবং ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা অর্থ থেকেই এঁদের বেতন দেওয়া হত। বর্তমানে 'টোল' সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। স্বভাবতই টোলপণ্ডিত নীরবে হারিয়ে গেছেন।

**কবিয়াল :** পল্লিবাংলার এক বড় অঙ্গ 'কবিগান' বা 'গানের লড়াই'। মূলতঃ জমিদারগণ তাঁদের মজলিসে এই আসরের আয়োজন করতেন। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি আর ছড়া কেটে নানান বিষয় নিয়ে গানের বোলে কথার লড়াই হল 'কবিগান'। যাঁরা ছড়া কাটতেন তাঁরাই 'কবিয়াল'। এঁরাও আজ বিলুপ্ত হতে বসেছেন।

**ঘরামি :** যাঁরা মাটির ঘর তৈরি করেন তাঁদের ঘরামি বলা হয়। একসময় গ্রামে-গঞ্জে এঁদের রমরমা বাজার ছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ বাড়িঘর ইট-সিমেন্ট নির্মিত। গ্রামেও মাটির ঘর আজ চোখে পড়ে না। তাই ঘরামিরা আজ উপেক্ষিত; অন্য কাজে জীবিকার তাড়নায় নিজেদের বদলে নিয়েছেন।

**বাড়ুই :** মাটির ঘরের ছাদ মূলতঃ উলু-খড়, ধান ও গমের খড় প্রভৃতি উপাদান দ্বারা তৈরি হত। যাঁরা এই ছাদ তৈরি করতেন তাঁদের 'বাড়ুই' বলা হত। মাটির ঘর আজ আর বিশেষ তৈরি হয় না। তাই ঘরামিদের ন্যায় বাড়ুইদেরও পেশা আজ সংকটের মুখে।

**ভারী বা বাঁকি :** ইঁদারা, কূপ, নলকূপের যখন ঘরে ঘরে প্রচলিত হয়নি তখন 'ভারী' বা 'বাঁকি'রা জল সরবরাহের দায়িত্ব বহন করত। তাঁরা বাঁকের সাহায্যে অথবা ঘড়া করে জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গৃহস্থের চাহিদা মেটাত। আজ আর বাঁকিদের কদর ও চাহিদা কোনোটাই নেই। তাই তাঁরা অন্য কর্মে প্রবৃত্ত।

**ধোপা :** একদা বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা জামা কাপড় এনে প্রথমে পরিষ্কার তারপর ইস্ত্রি করে পরিপাটি করে তোলা ধোপা বা রজকের বৃত্তি ছিল। অধুনা লন্ডির যুগ আসার পর সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই পেশায় প্রবেশ করেছে। সাত পুরুষের পেশা হারিয়ে ধোপারা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করেছে।

**পটুয়া :** পটের ছবি দেখিয়ে পট শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করে গ্রামে-গঞ্জে উপার্জন করতেন। সাধারণতঃ বেদে সম্প্রদায়রা গ্রামে গ্রামে ঘুরে পটের কাহিনি বর্ণনা করতেন। এগুলিকে পটের গান বলা হত। কাহিনিগুলো পৌরাণিক অথবা লোকগাথা ভিত্তিক হয়। বর্তমানে পটুয়া সম্প্রদায় তাদের পরম্পরা থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছেন। বিলুপ্ত হয়েছেন এই পটুয়ারা।

**নিকারী :** গ্রাম-গঞ্জে, শহরের অলিতে-গলিতে ছাতা সেলাই করে জীবিকা অর্জন করা নিকারীদের কাজ ছিল। বর্তমানে এদের দেখা মেলা ভার। রুজি-রোজগার তেমন কোনো পসার না হওয়ায় নিকারীরা তাদের এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় মনোনিবেশ করেছে।

**সাপুরিয়া :** সাপুড়িয়া বা সাপুড়েদের কাজ ছিল বিভিন্ন প্রজাতির সাপ দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করা। এঁরা মূলতঃ বেদে সম্প্রদায়ের মানুষ। সাধারণতঃ এঁরা 'সাপের নাচন' দেখিয়ে রোজগার করতেন। এখন সাপুড়িয়াদের তেমন চোখে পড়ে না। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বেশি উপার্জনের আশায় অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছেন।

**ধাইমা :** হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র যখন গড়ে ওঠেনি তখন এই ধাইমা বা ধাই-রাই প্রসূত মায়েদের পরিচর্যার মতো দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। শিশুদের লালন-পালনও এঁরা সামলাতেন। আঁতুড়ঘরে সন্তানের জন্মগ্রহণের সময় সেবিকাদের ভূমিকা নিতেন। এখন ধাইমা বা দাইমা (প্রচলিত কথায়) বৃত্তি প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

**চৌকিদার :** জমিদার অথবা গ্রামের মোড়লরা তাঁদের অঞ্চল পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার নিযুক্ত করতেন। একসময় পাহারা দেওয়া ব্যতীত ফসলের হিসাবনিকেশ, জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান, জিনিসপত্রের বাজার পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি এঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। জমিদারপ্রথা বিলোপের পর চৌকিদার পদ লুপ্ত হয়েছে। এই বৃত্তি কবেই লুপ্ত হয়েছে!

**আলতামাসি :** নাপিত বউরাই আগে 'আলতামাসি' নামে পরিচিত ছিলেন। হিন্দুদের পূজা-পার্বণ মঙ্গলানুষ্ঠানের আগে এবং বৃহস্পতিবার আলতামাসিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সধবা-রমণীদের পায়ে আলতা পরিধান করাতেন। এই সময় তাঁরা নানা গল্প ও ছড়া কাটতেন। এখন 'বিউটি পার্লার'-তে বিউটি প্যাকেজের মধ্যে আলতা পরানোর কাজটিও ঢুকে গেছে। এমন করেই ধীরে ধীরে কবে হারিয়ে গেছেন আলতামাসিরা!

**বাসনওয়ালা :** কাঁধে বাঁক আর দুইপাশে দুটি বিরাট ঝুড়ির মধ্যে বাসনপত্র নিয়ে গ্রাম-শহরের বুকে ঘুরে বেড়াত বাসনওয়ালা। তাদের হাঁকে আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটে এসে প্রয়োজনীয় বাসনপত্র কিনত। বর্তমানে প্রতিযোগিতার বাজারে এঁরাও হারিয়ে যেতে বসেছেন।

**রানার :** ডাক বিভাগের সঙ্গে 'রানার' বা 'ডাকহরকরা' যুক্ত থাকতেন। এঁরা চিঠিপত্রাদি বহন করে নির্দিষ্ট স্থানে দৌড়ে পৌঁছে দেওয়ার মতো গুরু দায়িত্ব বহন করতেন। পরবর্তীকালে দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন আবিষ্কৃত হওয়ায় ডাকহরকরার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে।

**বাগাল :** বনেদি ঘরে গবাদি পশু দেখভালের জন্য 'বাগাল' রাখা হত। এঁরা গবাদিপশুর সবসময় পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এই পশুদের মাঠে চরানো তাদের কাজ ছিল। এখন 'বাগাল' শব্দটি থাকলেও 'বাগাল' নিযুক্ত করার বিষয়টি লুপ্ত হয়েছে।

**খাজাঞ্চি :** খাজাঞ্চি সকল প্রকার খাজানা বা খাজানার হিসেবনিকেশ রাখতেন। তিনি ধনরক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। বর্তমানে এই পদটি কেবল গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। জমিদার, ধনীব্যক্তিরা এঁদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁদের চালিকা ছিলেন এই বৃত্তির ব্যক্তিবর্গরা।

**গোমস্তা :** জমিদারের কর সংগ্রহকারীরা গোমস্তা নামে পরিচিত ছিলেন। এছাড়া মহাজনের কর্মচারীদের গোমস্তা বলা হত। গোমস্তা জমিদারের তহশিলের কর আদায় করতেন। এঁদের চারপাশে পেশাদার লাঠিয়ালরা পরিবেষ্টিত থাকত। জমিদারগণ আজ আর নেই; তাঁদের অনুসরণ করেছেন গোমস্তাগণ।

**নায়েব :** নবাব, জমিদার এবং অভিজাতদের জমি ও অর্থসংক্রান্ত হিসেব রক্ষার দায়িত্ব সামলাতেন 'নায়েব'গণ। বর্তমানে নবাব, জমিদার প্রথা হারিয়ে যাওয়ার কারণে এই বৃত্তিটিও উঠে গেছে।

**বাজিকর :** বাজিকররা তাঁদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বানরদের নিয়ে গ্রাম-গঞ্জের পথে পথে খেলা দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করেন। তাঁদের হাতে থাকে ডুগডুগি আর কাঁধে ঝোলা। এখন এই খেলা দেখে খুব বেশি অর্থ উপার্জন হয় না। তাই বাজিকরদের রাস্তাঘাটে তেমন আর দেখা যায় না।

**ধুনুরি :** ধুনুরি বা ধুনরিরা ধুনাচি দিয়ে তুলা ধোনে লেপ বালিশ ও তৈরি করেন। এখন আধুনিক নানারকম শীতের আচ্ছাদন বাজার দখল করেছে। তাছাড়া কার্পাস তুলো তুলনায় দুর্মূল্য। তাই মানুষ লোভনীয় আকর্ষণীয়, সহজ মূল্যে দ্রব্যের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছেন। আর লুপ্তপ্রায় পেশার তালিকায় ধুনুরিরা ঢুকে পড়েছেন।

**কাবুলিওয়ালা :** কাবুলের লোকেদের 'কাবলি' বলে। এঁরা কাবুল থেকে এসে এদেশে ব্যবসা করতে আসত। পাশাপাশি এঁরা মোটা সুদের টাকা ধার দিত। বর্তমানে ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, ডাকঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে মানুষ টাকা ধার করতে পারেন। তাই কাবুলিওয়ালারাও ধীরে ধীরে তাঁদের এদেশীয় পাট চুকিয়ে দেশে ফিরে গেছেন।

**চুড়িওয়ালা :** গ্রাম-শহরে গলিতে চুড়িওয়ালা রঙবেরঙের চুড়ি নিয়ে ঘুরতেন। বাড়ির কিশোরী-যুবতী-মহিলারা তাঁদের পছন্দসই চুড়ি এঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে অসংখ্য দোকানে চুড়ির সমাহার চুড়িওয়াদের জীবিকা হরণ করেছে।

**রিক্সাওয়ালা :** রিক্সা চালকদের রিক্সাওয়ালা বলা হয়। মাত্র তিন চার বছর আগেও এই রিক্সাওয়ালাদের বাজার রমরমা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইলেক্ট্রনিক্স ব্যাটারিচালিত যানে বাজার ছেয়ে গেছে। প্যাডেল রিক্সা আজ হাতে গুনতি অবস্থায় পড়ে আছে। কাজ হারিয়ে রিক্সাওয়ালারা ছন্নছাড়াভাবে নানা পেশা নিয়েছেন।

এইভাবেই আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে একাধিক পেশার মানুষ জীবিকা হারিয়েছেন। রাইবেশে, পাটাকুটা, খলিফা, হাজাম প্রভৃতি বৃত্তিধারী মানুষও আজ আর চোখে পড়ে না। একদিন অধুনা প্রচলিত পেশাগুলি হারিয়ে যাবে। জন্ম নেবে নতুন পেশা। কেবল বইয়ের পাতায় লেখা থাকবে হারিয়ে যাওয়া নানাবিধ জীবিকাসমূহ।


**বিশেষ কৃতজ্ঞতা**

১। সুধাংশু কুমার দত্ত, মুকুন্দপুর, মুর্শিদাবাদ।
২। জসিম উদ্দিন সরকার, রুহিয়া, মুর্শিদাবাদ।
৩। নাজনীনা শবনম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
৪। সুস্মিতা ঘোষ, রণগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।
৫। ঋত্বিক বড়াল, সাটুই, মুর্শিদাবাদ।
৬। পাপিয়া মণ্ডল, পশ্চিমগামিনী, মুর্শিদাবাদ।
৭। মহাশ্বেতা বড়াল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।
৮। অনুপম বড়াল, ইন্দ্রপুরী, মুর্শিদাবাদ।
৯। গোলাম গাউস, রুহিয়া, মুর্শিদাবাদ।
১০। ছবি : ইন্টারনেট

# আলট্রা-মডার্ন

**সুকুমার রুজ**

না না আমি পৃথিবীর আলো দেখতে চাই না।

কিন্তু আমি চাই।

তুই দেখতে চাস্, দ্যাখ, আমি এই অন্ধকারের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেতে চাই।

তা আবার হয় নাকি! হয় দু'জনকেই নিঃশেষ হতে হবে, নয়তো দু'জনকেই জন্ম নিতে হবে।

তা কেন?

বুঝছিস না কেন, এখন দু'জনের জীবন-মরণ একই সুতোয় বাঁধা। একটা নাড়ি দিয়েই তো দুজনেরই শরীরে পুষ্টি রস সঞ্চারিত হচ্ছে। একই ধমনী দিয়ে দু'জনের শরীরে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। একই হৃদস্পন্দন দু'জনের ভেতর। একজনের পুষ্টি-বৃদ্ধি থেমে গেলে অন্যের থেমে যাবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতৃনাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তখন অন্য কথা।

হ্যাঁ সেই অন্য কথা ভেবেই তো আমি ভূমিষ্ঠ হতে চাই না। যতক্ষণ এই অন্ধকারে রয়েছি ততক্ষণ তুই আমি এক। যে মুহূর্তে আলোয় যাব, সেই মুহূর্তে তুই 'সোনার চাঁদ পুত্রসন্তান' আর আমি 'মাটির ঢিপি মেয়ে'। তখন তোর মুখ দেখে বাবা-মায়ের মুখে আলো ফুটবে আর আমাকে দেখেই নামবে অন্ধকার।

তুই আগে থেকেই এমনটা ভাবছিস কেন? এখন দিনকাল বদলেছে। মানুষের সংস্কার, ধ্যান-ধারণা পাল্টেছে। এখন...।

কিছু পাল্টায়নি রে! ওসব তঞ্চকতা। একটু চুপ থেকে কান পাত। শোন, মা-বাবা কি আলোচনা করছে। তা হলেই বুঝবি।

**দুই**

আঃ! পেটের উপর থেকে মুখ সরাও। গোঁফের খোঁচায় সুড়সুড়ি লাগছে।

দাঁড়া না বাবা! খোকনসোনাকে একটু আদর করছি আর তুমি...।

এখন আদর করতে হবে না। পেট থেকে বেরোক তারপর যত খুশি আদর ক'রো।

সে তো করবই। দুষ্টুটাকে এখন থেকেই আদর করি। বুঝুক বাপের আদর কাকে বলে। তখন তো বেশিরভাগ সময় তোমার কোলে থাকবে আর তোমার মেনি চুষবে। তখন মায়ের আদরকেই গুরুত্ব দেবে, বাপের আদরকে পাত্তাই দেবে না। ওর মা-ই তখন সব!

একদম কচিবেলায় তাই তো হয়। মা-ছাড়া আর কাকে চিনবে। বড় হয়ে তখন না হয়...।

ছেলেরা বড় হয়ে মা-কেই বেশি পছন্দ করে। বাপের কাছে ঘেঁষতেই চায় না।

কিন্তু মেয়ে হলে খুব বাপের ন্যাওটা হয় জান তো! আচ্ছা! ধর, ওটা যদি মেয়ে হয় তাহলে...।

হবেই না।

কি হবে না ?

মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। মহাভৃগু আমার হাত দেখে বলেছে প্রথম সন্তান হবে পুত্র। শুধু তাই নয়; বলেছে, সে একখানা রত্ন হবে। বাবা -মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে। জান ; মহাভৃগুর গণনা ভুল হয় না।

বাব্বা ! চুপি চুপি তুমি এত কিছু জেনে বসে আছ। কই আমাকে আগে বলোনি তো !

ইচ্ছে করেই বলিনি তোমাকে। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না।

কথা আবার পেটে থাকে নাকি। কথা তো মুখে থাকে।

ওই একই হল, ওটা কথার কথা। মুখ দিয়ে খেলে যেমন পেটে যায় তেমনি পেটের ভিতর কথা মুখের ভিতর দিয়ে বেরোয়।

যাক গে! ওসব বাদ দাও। হ্যাঁ গো! বলছিলাম, আমাদের খোকা বড় হয়ে কী হবে বলেছে?

রত্ন হবে রত্ন, এই টুকুই শুধু বলেছে, তবে ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার নাকি অর্থনীতিবিদ, সেসব কিছু বলেনি। যা হোক বড় ধরনের মানুষ হবে।

আমার ইচ্ছা ডাক্তারি পড়াব ছেলেকে।

ধ্যুর! যত্তসব সেকেলে চিন্তা-ভাবনা। আজকাল কেউ ডাক্তারি পড়ায় ছেলেকে। কত ডাক্তার বেকার হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধারধোর করে চেম্বার বানিয়ে বসে মাছি তাড়াচ্ছে। এখন কম্পিউটারে যুগ বুঝলে গিন্নি!

ছেলেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বানাব। স্টেটস্-এ যাবে চাকরি নিয়ে। মাসে হাজার হাজার ডলার কামাবে। আমরাও ঘুরতে যাব ছেলের কাছে।

উরিব্বাস! তুমি যে দেখছি বহুদূর পর্যন্ত ভেবে বসে আছ। এখনও তো জন্ম হল না তোমার ছেলের!

হবে তো! যা কিছু প্ল্যান পরিকল্পনা আগে থেকে ছকে নিতে হয়। তবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় বুঝেছ! একটাই তো নেব আমরা। তাই প্ল্যানমাফিক এগোতে হবে।

প্লান ছকছ ঠিক আছে। তবে যদি মেয়ে হয়, তাহলে ওই একই থাকবে তো প্ল্যান?

এই শোন! তুমি বারবার মেয়ে-মেয়ে বলো নাতো!

কেন? মেয়ে বললেই কি মেয়ে হবে? যা হবার তা তো অলরেডি পেটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। তবে আমি যা রোগা হচ্ছি, মনে হচ্ছে ছেলেই হবে।

**তিন**

কী রে। কী বুঝলি? এরপর কি আমার জন্মানো উচিত? অবাঞ্ছিত হওয়ার জ্বালাটা তো তোকে সইতে হবে না; আমাকে সইতে হবে। ওরা মেয়ের কথা ভাবতেই চায় না। ছেলে হবে ধরে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখে।

আচ্ছা! আমি একটা জিনিস বুঝি না, এখনও কেন মানুষ শুধুমাত্র ছেলের কামনা করে। আজকাল মেয়েরাও তো উপার্জন করছে। বাবা-মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিচ্ছে। দেশ-দেশান্তরে যাচ্ছে। এমনকি মহাকাশে অবধি পাড়ি দিচ্ছে। তবুও...।

শুধু আজকাল বলছিস্ কেন! চিরকালই মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের পিছনে ফেলে দিয়েছে মেয়েরা। তবুও মেয়ে অপাংক্তেয়। কেন অপাংক্তেয়, কেন অবাঞ্ছিত এসব নিয়ে অজস্র আলোচনা হয়েছে। আর চর্বিতচর্বণ করে লাভ নেই। মোদ্দা কথা, আমি পৃথিবীর আলো দেখতে চাই না।

শোন্! আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর্। তুই একা থাকলে যা ইচ্ছে করতিস্। কিন্তু আমি সঙ্গে রয়েছি যে। আমার ইচ্ছা – জন্মাব আমি, পৃথিবীর আলো দেখব। শুধু আলো কেন! আকাশ-বাতাস-মাটি, ঝরনা-নদী-সাগর, ফুল -ফল পাখি সব সবকিছু পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করব। পৃথিবী বড় সুন্দর রে।

সুন্দর না কচু! আগে সুন্দর ছিল। এখন শুধু হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা, হানাহানি কাটাকাটি খুনোখুনি। জানিস তো সারা পৃথিবী জুড়ে এখন সন্ত্রাস চলছে। তাছাড়া নানাভাবে দূষিত হয়ে গেছে পৃথিবী। বিশেষত মানুষের সমাজ। তাই সে সমাজের একজন অপাংক্তেয় কন্যাসন্তান হয়ে আমি জন্মাতে চাই না রে! আমি আজ থেকে অনশন শুরু করব। খাদ্যরস শোষণ করব আর।

তুই যদি খাদ্যরস শোষণ না করিস, তাহলে তুই মারা যাবি। সেইসঙ্গে আমারও মৃত্যু ঘটবে। কারণ একটি মৃতসন্তান মায়ের জঠরে তো বেশিদিন থাকতে পারবে না। তোর মৃতদেহ বের করতে গিয়ে আমাকেও বের করে ফেলবে। আমি মরে যাব। তোর জন্যে আমারও মৃত্যু হবে, এটা কি ঠিক কাজ ?

তা ঠিক নয়, কিন্তু আমি নিরুপায়। মা-বাবার আলোচনা শুনলি তো !

তা শুনলাম। তবে এক্ষেত্রে বোধ হয় তোর ওপর তেমন বিরূপ হবে না। কারণ এদের চাহিদা মতো একটা পুত্রসন্তান তো হচ্ছে।

হ্যাঁ, সে আবার নাকি মহাভৃগুর কথা অনুযায়ী 'রত্ন'। সুতরাং রত্নর কদর হবে আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি খাব। একা জন্মালে যা-ও বা একটু-আধটু আদর পেতাম, তোর সঙ্গে জন্মিয়ে তো আরও নাকাল হব।

আচ্ছা! এমন হতে পারে না, দুজনেই জন্ম নেওয়ার পর তুই স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করলি!

তুই বুঝি জানিস না যে, পৃথিবীর আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে আর নিজের ইচ্ছাধীন থাকা যায় না। যতক্ষণ এই অন্ধকার জঠরের পিচ্ছিল তরলে নিমজ্জমান থাকা যায়, ততক্ষণ আমরা স্বাধীন।

সে তো একা থাকলে স্বাধীন। দু'জন থাকলে আর স্বাধীনতা কোথায়! এই যে আমি জন্মাতে চাইছি তুই চাইছিস না। তাহলে আমার স্বাধীনতাটা থাকল কোথায় ! আর যদি আমার কথা মতো জন্ম নেওয়ার পথেই এগোস তাহলে তোর স্বাধীনতা রইল না।

হ্যাঁ, কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস! দু'জনে একসঙ্গে এক জঠরে থাকাতেই এ সমস্যা হল।

শোন্! আমি বলছি কি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করাটা পলায়ন ছাড়া আর কিছু নয়। কন্যাসন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের এত অনীহা যদি দুর করতে চাস; তাহলে জন্মাতে হবে। বড় হয়ে এদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কন্যাসন্তান কখনও ফ্যালনা নয়। সমাজকে সচল রাখা ও উন্নত করার ক্ষেত্রে কন্যা তথা নারীর ভূমিকা অপরিহার্য।

তুই কি ভাবছিস্ ওরা সেটা বোঝে না! সেই আদিমযুগ থেকে সমাজ পত্তন করা ও এ জায়গায় সমাজের উত্তরণ ঘটানোর পেছনে নারীর ভূমিকা যে কতখানি; তা কী ওরা জানে না ভাবছিস্! সবই জানে। কিন্তু স্বীকার করে না। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তো! পশু সমাজে নারী মর্যাদা পায়। কিন্তু মানুষের সমাজে কখনও নারীদের যোগ্য মর্যাদা পুরুষেরা দিতে চায় না।

সমাজটা তো আগে পুরুষতান্ত্রিক ছিল না। সভ্যতার প্রাক্কালে নারীতান্ত্রিক সমাজই ছিল। নারীরা সেটা ধরে রাখতে পারেনি। আসলে, নারীর যোগ্য মর্যাদা নারীরাও দেয় না। তা না হলে মা তো প্রতিবাদ করতে পারত। কন্যাসন্তানের পক্ষে কিছু বলতে পারত। তা তো বলল না।

সে বলার ক্ষমতা মা অর্জন করেনি, তাই...।

আরে বাবা! বললেও বাবা শুনছে কে! সচরাচর তোরা অর্থাৎ পুরুষেরা মেয়েদের কথার গুরুত্ব দিতে চাস না। মেয়েদেরকে সবসময় দাবিয়ে রাখতে চাস্।

আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষের অধীনে থাকতে ভালবাসে। বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। নিরাপত্তা পাবে, ভাবে।

মানতে পারলাম না। সব মেয়ে এমন নয়।

না তা নয়, তবে বেশির ভাগই। ওই যে শোন্ মা বাবাকে কী বলছে।

### চার

হ্যাঁ গো! আর তো বেশিদিন দেরি নেই। কোথায় ডেলিভারি হবে না হবে; সে ব্যাপারে কিছু ভাবলে?

তুমি হাসপাতালে কার্ড করিয়েছ। ওখানে তো নিয়মিত চেক-আপ করাচ্ছ।

হ্যাঁ, তা করাচ্ছি। তবে, ডাক্তার বলেছিল, পেটে জোড়া বাচ্চা আছে। আলট্রা সোনোগ্রাফি করিয়ে কনফার্ম হওয়া ভাল। সে তো করানোর উদ্যোগ নিলে না।

আরে বাবা! জোড়া থাক আর একটা থাক পেটের মধ্যেই তো রয়েছে। একগাদা টাকা খরচ করে সোনোগ্রাফি করিয়ে আর কী হবে। বেরোলেই তো দেখা যাবে। বাচ্চা নড়াচড়া করছে যখন, তখন ঠিকই আছে।

তুমি যখন 'না' বলছ তখন থাক। তবে জোড়া বাচ্চা থাকলে একটু আলাদা কেয়ার নেওয়া দরকার- ডাক্তার বলছিল।

আলাদা কেয়ার আর কী নিতে হবে? ডাক্তার যা ট্যাবলেট, ওষুধপত্তর লিখে দিচ্ছে, সবই তো এনে দেওয়া হচ্ছে। তুমি সেগুলো ঠিকমতো খাও, তাহলেই হল।

সে তো খাচ্ছি তবুও...।

তবুও কী? ওতে বাচ্চা ঠিকমতো বড় হচ্ছে না নাকি, পেটখানা তো দেখছি বেশ ডাগর হয়েছে। আর তুমি যদি বলো রোজ তোমাকে গাদাগাদা আপেল-নাসপাতি-বেদানা কিনে এনে খাওয়াতে হবে। তা আমি পারব না। সোজা কথা।

আমি কি সে কথা বলেছি! ঠিক আছে, কাল থেকে কোন ফলই খাব না। আমার পেটে ধরার কথা ধরেছি। বাচ্চা তো তোমারই, যেমন হওয়ার হবে।

ওরেত্তারা! খুব যে ঝাঁঝ দেখছি, খাবে খাবে, না খাবে না খাবে। আমার কী!

আমারই বা কী! বাচ্চা কানা-খোঁড়া-ল্যাংড়া হলে তোমাকেই ভুগতে হবে।

### পাঁচ

শুনলি তো! এই যদি ভূমিকা হয় মেয়েদের বা মায়েদের! তাহলে একশো বছরেও কি স্বাধীন হবি তোরা! আসলে, স্বীকার করিস আর না করিস্ পুরুষের অধীনে থাকাটা নারীর বৈশিষ্ট্য। ইচ্ছা করেই পুরুষের কাছে হার মানে নারী। যেমন তুই হেরে যেতে চাইছিস।

তুই ভুল বলছিস! পুরুষের অধীনে নারী নয়, নারীর অধীন হয়েই পুরুষ থাকে। কিন্তু পুরুষ সে অধীনতা স্বীকার করে না এটাই দুঃখের!

সে আবার কী? পুরুষেরা নারীর অধীনে থাকে কোথায়?

থাকে না? ভেবে দ্যাখ্ ভাল করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীর অধিষ্ঠান বাড়িতে। পুরুষেরা পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করে। নারীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকে। কিন্তু নারীর অধীনতা স্বীকার করে না। ক'জন নারী নিজে উপার্জন করে এনে পুরুষের ভরণ-পোষণ করে? আমার বক্তব্য হল, নারীকেন্দ্রিক সংসারে বসবাস করব। অথচ নারীর যোগ্য সম্মান দেব না। সর্বদা হেয় হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করব, এখানেই আমার আপত্তি। এই মানসিকতার পরিবর্তন চাই আমি।

তাই যদি চাস্, তাহলে মরতে চাইছিস কেন?

মানসিকতা পরিবর্তনের চেষ্টা কর্। তাহলেই তো হয়।

শুধু নারীর মানসিকতা পাল্টাতে হবে? তোদের মানে পুরুষের মানসিকতাও বদলাতে হবে।

মানসিকতা মানে তো মনের কার্যকারিতা। তাহলে মনকে বদলালেই তো মানসিকতা বদলাবে।

তবে আয়, আমরা দুজনে মন পাল্টাপাল্টি করে নিই। এটা এক অভিনব ব্যাপার। পুরুষের শরীর হয়েও তোর থাকবে নারীর মতো মানসিকতা। আর নারী হয়েও আমার হবে পুরুষের মতো মানসকিতা।

এ আর নতুন কী! এখন তো বিশ্ব জুড়ে এটাই চলছে। পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার আচরণে নারীরা পুরুষ আর পুরুষরা নারী।

আরে বাবা! সেটা তো বাহ্যিক। আমি চাইছি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন।

চাইছিস যখন তাই হোক। দেখা যাক, এতে সমাজের কোন পরিবর্তন আসে কি না।

পরিবর্তন আসবে না মানে। ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। নারীর অবয়ব আর পুরুষের মন নিয়ে আমি হব আলট্রা মডার্ন নারী। আর পুরুষের শরীরে নারী-সুলভ মনের অধিকারী তুই হবি আলট্রা মডার্ন পুরুষ। তারপর শুরু করব আন্দোলন। দেখবি সমাজটা কেমন বদলে যায়।

তাহলে এই কথাই রইল। তোর আর অনশন করে কাজ নেই। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং আমাদেরও এবার ঘুমিয়ে পড়া উচিত। তার আগে অবশ্যই মন বদলাবদলি করে নিই।

# জেনারেশন গ্যাপ

**চন্দন চক্রবর্তী**

সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে আই টি কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিল অভ্র। গোছা মাইনে, অবশ্য খাটনি প্রচুর। তারপরই গাড়িটা কিনেছি। দেখলে কেউ বলবে না সেকেন্ড হ্যান্ড। নোটের মাধ্যমে। তখনই হাসতে হাসতে বলেছিলেন অবিনাশ যেভাবে বাড়ির কাঁথা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে একদিন না মানুষ কেনাবেচা শুরু হয়। কল্পনা ওনার স্ত্রী যোগ করছিলেন তাই না তাই। অভ্র বলছিল তা বছর পঞ্চাশ পরে হতেই পারে।

তা সেই গাড়ি করে অবিনাশ, কল্পনা চলেছেন ছেলের পাত্রী দেখতে। শনিবারের সন্ধে। একমাত্র সুপুরুষ সুন্দর পুত্র। প্রথম কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছে। দাঁড়াও একটু পয়সা কড়ি জমাই। গাড়ি-টাড়ি কিনি, তবে তো বিয়ে।

কল্পনা বলেছিলেন, সব সময় টাকা টাকা করিস না তো? তোর বাবার কি কম টাকা ? সরকারি আমলার কাজ করে। সব ফ্রি। টাকাটা খরচ করবে কিভাবে খুঁজে পায় না। তোর অত চিন্তা কি ?

- উঁহু। আজকালকার মেয়েরা খুব চালু। ওরা বাপের মাল্লুটা উপরি হিসাবে দেখে। আসল দেখে পাত্র কী করে ? বলে বাপের সঙ্গে তো আর ঘর করব না। অতএব--

- ওসব বাচাল মেয়ে।

- এখন তো এইসব লেখাপড়া জানা 'কলরব' তোলা মেয়েই পাবে। তোমার মত ঘোমটা পরা হাউস ওয়াইফ কনসেপ্ট আর নেই।

- বাজে বকিস না অভ্র। তোর মা ফ্যালনা নয় রে ? তখনকার দিনে গড়িয়াহাটে বাসন্তী দেবী কলেজ থেকে পাস করা মেয়ে। বাপের একমাত্র মেয়ে দেখতে যথেষ্ট সুন্দরী ছিলাম।

- বুঝলাম। বহুত স্মার্ট, সুন্দরী ফর্সা, লম্বা পাঁচ ফুট দুই, গৃহকর্মে নিপুণা ইত্যাদি বা বা। মালাও দিলে শিক্ষিত রুচিবান বড় সরকারী চাকুরি আমার বাবাকে। তারপর সারাজীবন কী করলে? রান্নাঘরে, ঠাকুরঘরে কাটিয়ে দিলে।

- বা রে সংসারটা এমনি এমনি চলল। নিজে-হাতে মানুষ করেছি তোকে। সংসারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। তোর বাবা এখনও বলে লক্ষ্মী-মন্তর বউ।

এখন শিক্ষিতা মেয়েরা দশভূজা। ঘরের কাজ, বাইরের কাজ সমান ভাবে সামলায়, বুঝেছ।

- তোর ব্যাপারটা কী বলত ? কান খুলে শুনে রাখ, আমি কিন্তু ওসব দামড়া ফেসবুক মার্কা বৌ ঘরে তুলব না।

- ফেসবুক মানে?

- মানে আবার কী ? যাদের সঙ্গে কম্পিউটারে চ্যাটেং চ্যাটেং কর।

- চ্যাট করি।

- ওই হল। আমি কিন্তু সোনার সংসার ভাঙতে দেব না।

তখন অভ্র হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ পাত্তা দেয়নি। তারপর শেষ এক বছর অনেক সুন্দরী পাত্রী সন্ধান এসেছে। কিন্তু অভ্র আমল দেয় নি।

এদিকে একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে অবিনাশকে ঠ্যালা মারেন কল্পনা।

- শুনছ ?

বল শুনছি। অবিনাশের কথায় বিরক্তি। সারাদিন আমলার প্যাঁচ কষেছেন। কোথায় ঠান্ডা মাথায় একটু প্যাঁচ খুলবেন তার উপায় নেই। কে বোঝাবে, এই মাথার মধ্যে প্যাঁচ গোটান এবং খোলা দুই কাজই চলে।

বলেছিলাম, তোমার ছেলে হাবভাব সুবিধের ঠেকছে না।

কেন ?

দেখছো না, রাতদিন কম্পিউটারে ফেসবুক করছে। রাত অবধি মোবাইল কানে কথা বলছে। তুমি কি ভেবেছ ও অফিসের কম্ম করছে ?

হুম। তাই করছে। টেলিকনফারেন্স করতে হয় রাত্রে। বিদেশি ক্লায়েন্ট। আমাদের রাত মানে ওখানে অফিস টাইম বুঝেছ। এই তো বলছিল, একটা প্রজেক্টের জন্য ওকে এক মাসের জন্য লন্ডন যেতে হবে।

লন্ডন! লন্ডনফন্ডন পরে হবে। আগে ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর।

আরে বাবা ছেলের বাজারদর বাড়বে। বিলেতে যাতায়াত করা পাত্র। ভাবতে পারছ।

সে যাই কর। আমি কিন্তু রীতিমত ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেব। ঘরের হবু বৌকে। সংসারটাতো আমার।

ইতিমধ্যে অভ্র লন্ডনে এক মাসের জায়গায় দু'মাস প্রজেক্ট থ্রু করে ফিরে এসেছে। এসেই অবিনাশকে বলেছে, বাবা এবারে একটা বড় সড় জাম্প দেব।

- কল্পনা হাঁ। হ্যারে জাম্প দিবি মানে লাফাবি ? কোথায় এবারে আমেরিকায় নাকি ?

অভ্র, অবিনাশ হেসে ফেলেছিলেন।

- না রে বাবা। ওর একটা বড়সড় প্রমোশন হবে।

এসব এসব জাম্পা জাম্পির মধ্যেও কল্পনার এক চিন্তা তার মানে পাত্রীটি আরও হাই-ফাই। উহু! এ কি গেরো। ছেলের প্রমোশনেও শান্তি পাচ্ছেন না উনি। চুপ করে যান। ঠিক হ্যায় ম্যায় হুনা। আতশ কাচ মে দেখকে সিলেক্ট করুঙ্গি।

যে ছেলে বিয়ে নিয়ে ন্যাজ নাড়া দিচ্ছিল সেই হঠাৎ গত রবিবারের সকালে চায়ের চুমুক মারতে মারতে বিজ্ঞাপনের কাগজটা দেখিয়ে বলল, চল এই মেয়েটিকে একদিন দেখতে যাই। কল্পনা ভুরু ভেঙে কত্তার দিকে তাকালেন। ভাবটা ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। তোমার পুত্রটি নিঘঘাৎ কোথাও ফেঁসেছে।

- তা এত মেয়ে থাকতে হঠাৎ ওই মেয়েটি ?

- দেখতে শুনতে ভাল। এই দ্যাখ ছবি। পোস্টকার্ড সাইজের রঙ্গিন ছবি। সুচিত্রা সেন তিল আছে। দেখতে সুন্দরী।

- তুমি এই ছবি পেলে কোত থেকে?

- আমার এক অফিসের কলিগের মাসতুতো বোন। ও-ই ছবিটা হাতে ধরিয়ে বলেছিল, ভালো মেয়ে, শিক্ষিতা, দেখতে পারিস। ওর বিয়ের বিজ্ঞাপনটা রবিবার পেপারে বেরচ্ছে। সেই মত আজকে বেরিয়েছে।

- বিজ্ঞাপনের ছবি দেয়নি তো। ওই মেয়েটি যে এই মেয়ে জানলে কী করে ?

- বা, ওতো ফোন করে জানাল।

- ও তো মানে ? মেয়েটি ?

- না রে বাবা। অফিস কলিগ তমাল।

কল্পনা তখন সি আই ডি-র ওপরে জাঁদরেল অফিসারের ভূমিকায়।

অভ্র কিছুটা অসন্তুষ্ট।

- আচ্ছা মা বিয়েটা তো আমিও করব না কি? আমার ইচ্ছে-ইচ্ছি নেই?

- তা বাবা তুমি তো করবে, কিন্তু বৌমাটা তো আমাদের হবে।

হুমড়ি খেয়ে পড়লেন খবরের কাগজে। দেখা যাক লেখাটা কি আছে।

হুম, ২৫/৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, ফর্সা, সুন্দরী, এস এস সি, চাকরিমনস্কা...

- চাকরিমনস্কা মানেটা কী ?

এবার অবিনাশ উত্তর করেন।

শিক্ষিত মেয়ে চাকরি করতেই পারে। ঘরে বসে থাকবে নাকি।

- সংসার করবে কে ?

- ধ্যুৎ যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না ?

- তার কোনও লক্ষণ বিজ্ঞাপনে নেই। 'গৃহকর্মে নিপুণা' কথাটাই নেই।

- ও আজকাল থাকে না। তোমাকে তৈরি করে নিতে হবে।

যাই হোক সেই মেয়ে দেখতে চলেছেন ওরা। গাড়ি

চলছে হু হু করে গড়িয়ার দিকে। ঠান্ডাটা ফুলে দেওয়া। বাংলা গান বাজছে, আমাকে আমার মত থাকতে দাও... নিজেকে নিজের মত গুছিয়ে নিয়েছি...

পিছনের সিটে অবিনাশ এবং কল্পনা।

মুখ ভেটকে কল্পনা বলেন, গানের ছিরি দেখেছ। এবাই সব সব্বনাশ করছে। তারপরে আজকাল সিরিয়ালগুলো যা দেখাচ্ছে...বোমাগুলো... ছ্যা ছ্যা।

কিছুক্ষণ গান শোনার পর কল্পনা বললেন, হ্যাঁরে তোর রবীন্দ্রসংগীত নেই ?

হ্যাঁ থাকবে না কেন? শুনবে ?

ও চেঞ্জ করে দিল 'আমার সোনার হরিণ চাই তোরা যে যা বলিস ভাই।'

তুই বন্ধ কর বাবা। আমার গান শুনে কাজ নেই।

অভ্র চেঞ্জ করে বিসমিল্লার সানাই হালকা করে চালিয়ে দিল।

অত সানাই শোনার কি আছে ? বিয়ে তো এখনও হয়নি, বাবা।

হঠাৎ অবিনাশের হাতে ফোল্ড করা বিজ্ঞাপনের কাগজটা দেখে কল্পনা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁগো ওটা কেন নিয়েছ ? ফর্দর মত মিলিয়ে দেখবে বলে ?

উঁহু, ইন্টেলিজেন্সি টেস্ট করব।

দোহাই বেশি ইন্টালিজেন্সি মেয়ে দেখো না।

তুমি আবার বলে বসো না। মা কাপড়টা তুলে একটু হাঁটতো, গান করো।

শোন ফালতু ভাববে না আমাকে। বাসন্তী দেবীর গ্র্যাজুয়েট আমি। সেটুকু সেন্স আছে।

মেয়ে হঠাৎ অর্পিতা বসে সোফায়। দু'পাশে বাবা,মা। অন্যদিকে আর এক মাসি এবং তমাল। অভ্র কলিগের পাশে। উল্টোদিকে অবিনাশ, কল্পনা। বেশ বড় ঘর। মেঝেতে কাশ্মিরী কার্পেট, বেশ সাজানো, গোছানো। এক কোণে ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গোছা। মেয়েটি ডায়গোনালি অভ্রর দিকে মুখ করে। অভ্র মিটিমিটি হাসছে। মেয়েটির মুখে সুপ্তহাসি।

কল্পনার ফিসফিসানি।

তোমার ছেলেটা কেমন হ্যাংলার মত দেখছে, দেখেছে ?

হবু বউকে দেখবে না ?

ন্যাকা! তুমি যে কি টেস্ট করবে বলছিলে ? তাড়াতাড়ি সারো।

পরে, তোমারটা আগে সেরে নাও।

বেশ কিছুক্ষণ কথা চলল।

কল্পনা, পর পর তিনটে রান্নার প্রসেস জিজ্ঞেস করলেন পনির পসিন্দা, ছানা-ফুলকপির কাটলেট, কর্ণ ক্রোস্টেড চিকেন।

মেয়েটি টপাটপ উত্তর দিল। মানে ম্যারিনেশনের উপকরণ এবং সময়ও ঠিক বলল।

অদ্ভুত, কল্পনা খুশি নন। উল্টে কত্তাকে বললেন, অনেকটা সিরিয়ালের ওই বদমাইশ বউটার মত চাউনি। হতাশ উনি।

কি গো এবারে তুমি কি জিজ্ঞেস করবে বলছিলে --

অনেকটা টিভির কুইজ কনটেস্টের ঢং-এ অবিনাশ, বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাটা উল্টে কভার পেজ দেখিয়ে বললেন। এটার অর্থ কী? সবুজ বর্ডারে লেখা-- পাত্র-পাত্রী ২-১৬ পৃষ্ঠা, চাকরি-১৯, ভ্রমণ-১৮ এবং জ্যোতিষ-২১।

অর্পিতা মাথা নত করে ভাবল কিছুক্ষণ।

চাকরির সাপ্লাই কম মাত্র একপাতা অ্যালোটেড। পাত্রর তুলনায় পাত্রীর সাপ্লাই প্রচুর তাই তের পাতা। রেজাল্ট হলগে কাপল কম, ভ্রমণ কম মাত্র এক পাতা। সবাই ঝুঁকছে জ্যোতিষচর্চার দিকে, এক পাতা দিয়ে শুরু।

ওর উত্তর শুনে উচ্ছ্বাসিত অবিলাশ। অভ্র প্রায় ইউরেকা টাইপের লাফ। আর কল্পনা হতাশার শেষ পর্যায়ে। বাবাঃ এ তো তুখোড় মেয়ে। জাঁহাবাজ মেয়ে। গট-আপ কেস নয় তো ?

বাড়ি ফিরছেন ওরা।

এত ইন্টালিজেন্ট মেয়ে চলবে না। চিন্তান্বিত কল্পনা।

কেন? ও তো রান্নার উত্তরগুলোও ঝপাঝপ দিল।

ছাই দিয়েছে, অত্যন্ত চালাক, লাস্ট ক'দিন 'অতশীর রান্নাঘর' মুখস্থ করেছে।

তুমিও কি তাই।

হ্যাঁ। মডার্ন রান্না আর কোথায় পাব না ? মোচার ডানলা কেমন করে তাতো জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। বাপের জন্মেও করবে না।

গুড। তার মানে মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

সেখানেই ভয়। ও আমাকে ট্যাঁকে পুরে, অভ্রর ট্যাঁক খালি করবে। এ আমি হতে দিতে পারি না। আমার সাধের সংসার।

অভ্র চুপ। গানে মন দিয়েছে।

শোন, অভ্র, এ মেয়েকে বিয়ে করলে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার দেখা পাত্রী বিয়ে করবে করতে হবে। কথার নড়চড় হবে না। এই আমার শেষ কথা।

গম্ভীরসে অভ্র বলল, 'তুমি যা চাও তাই হবে'।

গিন্নি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কত্তার সঙ্গে। অভ্র মায়ের কোন চাওয়াটা ধরল চলে যাওয়া নাকি পছন্দের পাত্রি বিয়ে করা। বোঝা গেল না। গাড়ি চলতে থাকে হু হু শব্দে।

# ছাতা

**সিদ্ধার্থ সিংহ**

একটি তিন তলা বাড়ির ঝুলবারান্দার নীচে কোনও রকমে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। সরতে সরতে প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে লেপটেও মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার তোড়ে ভেসে আসা ঝিরিঝিরি বৃষ্টির ছাট থেকে কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারছে না সে। এর মধ্যেই শাড়ির নীচের দিকটা একরকম ভিজে গেছে। তাই ও এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কাছাকাছি এর থেকে বড় কোন ছাউনি পাওয়া যায় কি না। পেলে এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়াবে। বলা যায় না, এই ছিটেফোঁটা বৃষ্টিই হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে মুষলধারে শুরু হয়ে যাবে।

যাদের তাড়া আছে, তাদের কেউ মাথায় রুমাল পেতে অথবা মাথার উপরে ব্যাগ কিংবা একটা ভাঁজ করা কোনও খবরের কাগজ ধরে বড় বড় পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে। আসলে বর্ষা মানেই তো আর প্রতিদিন বৃষ্টি নয়। তাছাড়া আজ যেহেতু সকাল থেকেই আকাশটা এত ঝকঝকে ছিল যে, কেউ ভাবতে পারেনি হঠাৎ করে এমনটা হবে।

কানাই অবশ্য আর পাঁচ জনের থেকে একটু আলাদা। আকাশ যতই উজ্জ্বল থাকুক না কেন, ও ঠিক বুঝতে পারে, কখন বৃষ্টি নামবে। তাই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হওয়ার অনেক আগেই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে।

শ্যেন দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে গাড়ি রাস্তার প্রায় মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল সে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই মেয়েটি। গোলগাল চেহারা। হাইটটাও আর পাঁচটা গড়পড়তা বাঙালি মেয়ের মতোই। গায়ের রং ফর্সাই বলা যায়। খুব বেশি হলে বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। পরনে সিল্ক জাতীয় চকচকে শাড়ি।

এরকম শাড়ি পরা মেয়েই তার বেশি পছন্দ। ছুঁলেই মনে হয় শাড়িটা পিছলে সরে যাবে। তাই বাসে বা ট্রেনে উঠলে, যত সুন্দরীই হোক না কেন, সুতির শাড়ি পরা কোনও মেয়ে নয়, পাতলা, নরম শাড়ি পরা মেয়েদের দিকেই ও এগিয়ে যায়।

আরও কয়েক পা এগোতেই বুঝতে পারলাম। মেয়েটার সামনের চুলগুলো লক্স কাটা। কেন জানি না, তার বরাবরই মনে হয়, এই ধরনের লক্স কাটা চুলের মেয়েদের পটানো সব চেয়ে সহজ।

এমন হতেই পারে, কোনও এক সময় কোনও মেয়ের

সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করার জন্য যখন সে এক পা এগিয়েছিল, তখন সেই মেয়েটাই হয়তো নিজে থেকে দু'পা এগিয়ে এসেছিল। এবং খুব সহজেই সেই আলাপটা হয়তো দানা বেঁধে উঠেছিল। খুব নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল একে অপরের সঙ্গে। হতেই পারে। আর সেই মেয়েটারই হয়তো এ রকম লক্‌স কাটা চুল ছিল। তাই তার মনের মধ্যে হয়তো গেঁথে গেছে, লক্‌স কাটা মেয়েদের তোলা খুব সহজ।

না। বেশি কাছে যেতে হল না। বিকেল ফুরোবার আগেই আজ অন্ধকার নেমে এসেছে ঠিকই। তবু কয়েক পা এগোতেই, ল্যাম্পপোস্টের তীব্র আলোয় ও লক্ষ্য করল, মেয়েটি বিবাহিত।

ব্যস। হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেল কানাই। কারণ, তার বিশ্বাস- সিল্ক শাড়ি, চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়স, লক্‌স কাটা চুল এবং তার উপরে সে যদি বিবাহিত হয়, তা হলে আর কোনও কথাই নেই। একেবারে ষোলোয় ষোলোআনা। সে যেন রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কারও ইশারার জন্য।

কিন্তু এত হালকা বৃষ্টি! কী করে যে কী করবে, কানাই কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। বৃষ্টিটা একটু জোরে হলে না হয় 'এই ছাতায় মানছে না' ভান করে, ছাতা বন্ধ করে ওই ঝুলবারাদার নীচে গিয়ে ওই মেয়েটির পাশে অনায়াসেই দাঁড়ানো যেত। দু'চার মিনিট পরেই, একা একাই বলা শুরু করত, 'ইশ্, কী শুরু হল না ! কখন যে থামবে! এই রে, আরও জোরে নামল বোধহয়! ...' বলতে বলতে হঠাৎ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ফস করে বলে ফেলা যেত- দেখেছেন কী অবস্থা? একটা রিকশা পর্যন্ত নেই। বৃষ্টি নামার আর সময় পায় না। দেখবেন, রোজ ঠিক এই সময়ে...

তারপর অবস্থা বুঝে বলে ফেলা- আপনি কদ্দুর যাবেন ?

উনি যে দিকেই বলুন না কেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলা, তাই? আমিও তো ওদিকে যাব। দাঁড়ান, বৃষ্টিটা একটু ধরুক। আমি আপনাকে এগিয়ে দেব।

আর সেটা শুনেও মেয়েটি যদি আপত্তি না করে, ব্যস, হয়ে গেল। তারপর একই ছাতার তলায় যেতে যেতে আরো কাছাকাছি হওয়া। কাঁধে কাঁধ লাগানো। রাস্তায় সামান্য জল জমে থাকলেও, তার থেকে বাঁচিয়ে তাকে নিয়ে হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ছাতার তলাটা কে কদম গাছের তলা ভেবে নেওয়া। তাকে রাধা আর নিজেকে কৃষ্ণ মনে করা। মনে করা কেন? সে তো আসলে কৃষ্ণই। কৃষ্ণেরই তো আরেক নাম কানাই, নাকি?

কিন্তু এই ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ওসব কিছুই করা যাবে না। তাই মনে মনে সে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল, হে ভগবান, বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। আমি তোমাকে এগারো টাকা দিয়ে পুজো দেব।

আচ্ছা, এগারো টাকা কি খুব কম হয়ে গেল। সে যখন ছোট ছিল, পরীক্ষার রেজাল্ট আনতে যাওয়ার আগে মা কালীর সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলতো, তোমাকে পাঁচ সিকে দিয়ে পুজো দেব, তুমি আমাকে এ বারকার মতো পাস করিয়ে দাও মা। এর পর থেকে আমি ঠিক ভালোভাবে পড়বো, তুমি দেখে নিয়ো।

কিন্তু কোনও বারই ভালো ছাত্রদের মত তার আর পড়া হত না। ডাংগুলি খেলে, ঘুড়ি উড়িয়ে, স্কুল কেটে বন্ধুদের সঙ্গে পুকুর পাড়ে বসে বসে গল্প করে সময় কাটিয়ে দিত। আর প্রতিবারই যথারীতি রেজাল্ট বেরোবার কয়েকদিন আগে থেকে ঠাকুরকে ডাকত।

এবং অবাক কাণ্ড। ঠাকুর তার কথা শুনত। যে ভাবেই হোক, টায়েটুয়ে, টেনে হিঁচড়ে কী করে যেন সে ঠিক পাস করে যেত। আর পাশ করলেই যে কে সে-ই।

তখন পাঁচ সিকেয় কাজ হত। তার দামও ছিল। এখন তো সিকেয় উঠে গেছে। আটানা উঠব উঠব করছে। সত্যি কথা বলতে কি, এখন এক টাকারও আর সে রকম কদর নেই।

এই তো সেদিন রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল। যেতে যেতে হঠাৎ দেখে, সামনে এক ভদ্রলোক প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বার করছে। রুমাল তো বেরোল, কিন্তু সেই রুমালের সঙ্গে যে পকেট থেকে এক টাকার একটা কয়েন বেরিয়ে পড়ল এবং পড় তো পড় একেবারে রাস্তার মধ্যে, লোকটা সেটা খেয়ালই করল না।

পেছন থেকে 'ও দাদা, দাদা, আপনার টাকা পড়ে গেছে' বলতেই, লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝলক নীচের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কস্টিংয়ে পোষাবে না। বলেই যেভাবে হেঁটে গেল, কানাই অবাক। কস্টিংয়ে পোষাবে না মানে? পরে বুঝেছিল, ওই টাকাটা নিচু হয়ে তুলতে গেলে তার যা পরিশ্রম হবে, তার তুলনায় ওই টাকাটার মূল্য তুচ্ছ। অর্থাৎ, ওটা যদি এক টাকা না হয়ে দশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকার কয়েন হত, তা হলে হয়তো তুলত।

কিন্তু ঠাকুর দেবতারা তো এসবের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তারা কি আর অত খোঁজ খবর রাখে। বাসের ভাড়া দশ পয়সা থেকে কবে হুট করে পাঁচ টাকা হয়ে গেল। গ্রীষ্মকালের এক হাত লম্বা এক টাকার একদম টাটকা জবা ফুলের মালা শীত পড়তেই কি ভাবে কমে এক বিঘত হয়ে যায়। অথচ দাম হয়ে যায় কম করেও তিন টাকা। পাঁচ পয়সার গুজিয়া দাম বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, মিষ্টির দোকানের মালিকরাই শেষ পর্যন্ত লজ্জায় পড়ে গুজিয়া বানানোই

ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

না। ঠাকুরদের এ সব জানার কথা নয়। আর তারা যখন এ সব জানে না, তখন তাদের কাছে একশো টাকাও যা, এগারো টাকাও তাই। আর পাঁচ সিকেও তার ব্যতিক্রম নয়। না মা, এগারো টাকা নয়, তোমাকে আগেও যা দিতাম, এখনো তাই দেব। ওই পাঁচ সিকে দিয়েই পুজো দেব মা। একেবারে নগদা নগদি। তুমি এই বৃষ্টিটাকে শুধু একটু জোরে করে দাও। একটু জোরে। না হলে যে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না মা। মা হয়ে তুমি সন্তানের ডাকে সাড়া দেবে না? আজ যদি তোমার নিজের ছেলে হত, তুমি কি এ ভাবে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারতে? তোমার কষ্ট হত না ? একটু দয়া করো মা, একটু দয়া করো। বৃষ্টিটাকে একটু জোরে করে দাও মা।

কিন্তু দেখা গেল এত কাকুতি-মিনতি করেও কোন কাজ হল না। বৃষ্টির তেজ এতটুকুও বাড়ল না।

তবুও মেয়েটি যে বাড়িটির ঝুলবারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ি-রাস্তা থেকে উঠে গেল সেই ফুটপাথে। এবং তাজ্জব ব্যাপার, সে যখন মেয়েটিকে আড়চোখে দেখতে দেখতে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল, দাদা আপনি কি ওই দিকে যাচ্ছেন ?

আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল কানাই। শুনেছে শুনেছে, ঠাকুর তার কথা শুনেছে। আর কোন কথা নয়। এ বার তার কেরামতি দেখানোর পালা। তাই সে থমকে গিয়ে গদগদ হয়ে বলল, হ্যাঁ, ওদিকেই যাচ্ছি।

- আমাকে একটুও বাস স্টপেজের কাছে ছেড়ে দেবেন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন না... বলেই, ছাতাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল কানাই। মেয়েটির টুক করে ছাতার তলায় এসে তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

কানাই বুঝল, মাল ফেঁসেছে। একবার যখন মেয়েটি তার ছাতার তলায় এসেছে, তার নাইন্টি পারসেন্ট কাজ হয়ে গেছে। এই পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়সে কম মেয়েকে তো আর সে ছাতার তলায় আনেনি। কবে যে প্রথম কোন মেয়েটিকে এইভাবে ছাতার তলায় সে এনেছিল, এখন আর মনেই পড়ে না। তবে হ্যাঁ, তার মধ্যেই বেশ কয়েকজন তার মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে গেছে। এখনও রাতে শুয়ে শুয়ে সে সব কথা ভাবে। আহা, আরো যদি ও রকম ক'টা পাওয়া যেত...

কানাইয়ের বউ একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে খুব বড় পদে চাকরি করে। তার প্রায় দ্বিগুণ টাকা মাইনে পায়। স্বামীকে সে খুব কড়া শাসনে রাখে। এত কড়া শাসনে যে কানাই তার কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়। বউ স্নানে গেলে দরজার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বউয়ের স্নান করা দেখে। ঘুমের ভান করে খাটে শুয়ে শুয়ে বউয়ের শাড়ি ব্লাউজ পরা দেখে। এবং মেয়ে দেখলেই, যেখানেই হোক না কেন, সে বিয়ে বাড়িই হোক কিংবা শ্রাদ্ধ বাড়ি, নিকট আত্মীয়ই হোক অথবা অনাত্মীয়, পাশের বাড়ির বউদিই হোক বা বন্ধুর মেয়ে, সারাক্ষণই ছোঁক ছোঁক করে। তবে ওই পর্যন্তই। তার থেকে বেশি দূর এগোতেই পারে না।

না। শুধু যে বউকেই ভয় পাই, তা নয়। ভয় পাই একমাত্র ছেলেকেও। বউয়ের তত্ত্বাবধানেই ছেলে এখন ডাক্তারি পড়ছে। এনআরএসে। যদি কোনও ভাবে ও জানতে পারে। ছিঃ। তা হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় থাকবে না।

তার চেয়ে এই ভাল। বৃষ্টি বাদলা দিনে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়া। ছাতা তো নয়, যেন ছিপ। মাছ ধরার... থুড়ি, মেয়ে ধরার ছিপ। আর একবার যখন এই মেয়েটি তার ছিপে ধরা দিয়েছে, তখন তাকে আস্তে আস্তে ছিপ গোটাতে হবে। তারপর খপ্ করে...

কানাই আরও অনেক কিছু ভাবছিল। কিন্তু তার চিন্তায় হঠাৎ করে ছেদ টানল মেয়েটি। বলল, ভাগ্যিস আপনাকে পেলাম।

মুচকি হেসে কানাই বলল, তাই ?

- না হলে কতক্ষণ দাঁড়াতে হত বলুন তো! এই বৃষ্টি কখন থামবে তার কোনও ঠিক আছে? আর এই বৃষ্টির মধ্যে এতটা পথ আসতে হলে তো হয়েই যেত। একেবারে ভিজে একশা হয়ে যেতাম।

- সেটা অবশ্য ঠিক... আপনি কোথায় যাবেন ?

- ভিক্টোরিয়ার কাছে।

- ভিক্টোরিয়ার কাছে? আমিও তো ওখানেই যাব...

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, তাই নাকি? তাহলে তো ভালোই হল, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

মনে মনে কানাই বলল, ভগবান যা করে, মঙ্গলের জন্যই করে।

না। বেশিক্ষণ লাগল না। কথা বলতে বলতে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল ওরা। আর দাঁড়াতেই দেখল, একটা বাস আসছে। বাসটা ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়েই যাবে। কানাই বলল, চলুন, এটা যাবে।

মেয়েটিও উঠে পড়ল। বাসটায় খুব একটা লোকজন নেই। প্রথম গেট দিয়ে উঠে সামনেই একটা সিট পেয়ে গেল কানাই। কিন্তু সামনে সিট থাকা সত্ত্বেও মেয়েটি পিছন দিকের লেডিস সিটে গিয়ে বসল।

কানাই বলল, এখানেই তো সিট ছিল। অত দূরে গেলেন কেন?

পিছন চাকার উপরে পাতা কাঠের উঁচু পাটাতনটা চোখের ইশারায় দেখে মেয়েটি বলল, এখানে পা রাখতে

সুবিধা হয়।

কানাই শুধু বলল, ও... আচ্ছা আচ্ছা...

আগেই দুটো টিকিট কেটে নিয়েছিল কানাই। তাই বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম আসতেই মেয়েটির কাছে উঠে গেল সে। বলল, নামবেন না ? এসে গেছে তো।

ওর কথা শুনে মেয়েটিও উঠে পড়ল।

বাস থেকে নেমে কানাই জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাবেন ?

মেয়েটি বলল, ওই দিকে। আর আপনি ?

- আমার পরে গেলেও চলবে। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে গাড়িরাস্তা পেরিয়ে ভিক্টোরিয়ার মূল ফটকের কাছাকাছি আসতেই কানাই বলল, এ দিকে কোথায় ?

মেয়েটি বলল, এখানেই।

- এখানে! এখানে তো ভিক্টোরিয়া আর ও দিকে গড়ের মাঠ। কোথায় যাবেন?

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, কোথাও না। এখানেই দাঁড়াব।

- দাঁড়াব। মানে ?

- মানে দাঁড়াব। আমি তো এখানেই দাঁড়াই।

- দাঁড়ান? কার জন্য ?

মেয়েটি দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা কোণ টিপে বলল, এই ধরুন, এখন আপনার জন্য।

- মানে ?

মেয়েটি আলতো করে হেসে বলল, আড়াল করার জন্য তো আপনার কাছে ছাতা আছেই। ভিক্টোরিয়ায় গেলে আশি টাকা। আর... বলেই, চোখের চাহনিতে গড়ের মাঠের দিকে ইশারা করে বলল, ও দিকে গেলে দেড়শো টাকা।

- টাকা !

মেয়েটি এবার একটু রূঢ়স্বরেই বলে উঠল, নয়তো কি মাগনায় ?

ব্যস। মেয়েটি কী বলতে চাইছে, সেটা বুঝতে আর এক মুহূর্তও সময় লাগল না কানাইয়ের। ছিটকে ক'হাত দূরে সরে এল। তার পর পড়ি কি মরি করে বড় বড় পা ফেলে, নাকি দৌড়ে সে বাস স্টপেজে এসেছিল, বাস ধরেছিল, নাকি রুদ্ধশ্বাসে ছুটেই বাড়ি এসেছিল, এখন আর তা মনে পড়ে না।

তবে শুধু সে দিনই নয়, তার পর থেকে ওই দিনের কথাটা মনে পড়লেই কানাইয়ের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। হাত পা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। আর মনে মনে বলে, না। আর ছাতা নয়। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি কেন ? মুষলধারে বৃষ্টি হলেও আর কক্ষনো ছাতা নয়। কক্ষনো নয়।

# শনির বার

ডি. অমিতাভ

চঁচ্ কালো দাড়ি ইন্দার। প্রায় দাড়ির মতো কালো তার গায়ের রং। বেঁটে খাঁটো চেহারা। কম বয়েস থেকে খাটতে খাটতে ঈষৎ বাঁকা তার উর্ধাঙ্গ। জামা খোলা অবস্থায় বুকের খাঁচা ফুটে ওঠে। পেশি পাকানো। গোঁফ তার খোঁচা খোঁচা, অযত্নলালিত। বুকে ঘন লোম, চুলের মতোই মোটা কালো, জামার ভেতর থেকে উঁকি মারে। কখন সে দাড়ি রাখে আর কখন দাড়ি রাখে না বোঝা বড় মুশকিল। হাতে পয়সা থাকলে ধোপদূরস্থ আর না থাকলে দাড়ি চল্লিশ দিন পেরিয়ে নূর হয়ে যায়! জুম্মার নামাজ পড়ে প্রতি শুক্রবারে; তার বেশি সে ধর্ম বোঝে না। ঈদ, মিলাদে আনন্দ করে। মহরমের শিয়া সুন্নি বিভেদ মানে না। আসলে ইন্দা নয়, সে যে ইন্দাদুল হক্ সেটাও সে ভুলে যায় মাঝে মাঝে।

মিশ্ কালো অন্ধকারে ইন্দা ভ্যানের উপর বসে আছে। বাস স্ট্যান্ডে দু-একটা দোকান। এখনও জমে ওঠেনি মোড়টা। মোড়ের দু'দিকে বাঁখারীর বেড়া দিয়ে জায়গার দখল নিয়ে রেখেছে লোকজন কিন্তু দোকান করার ভরসা পাচ্ছে না। দখল জায়গার ভেতরে বেশির ভাগ লোক-ই কলা গাছ পুতে রেখেছে। আর লম্বা লম্বা কলা গাছে মোড়টা সন্ধে হলেই আরও বেশি নিঃঝুম লাগে। একটা ময়রা দোকান দড়মার বেড়ার। মিষ্টি সিঙ্গাড়া, গজা, বোঁদে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় চাও বানায়। তার থেকে অনেকটা দূরে একটা মনিহারী দোকান। পাঁচ ইঞ্চি ইঁটের গাঁথনি। মাথায় সবে সবে চুরি হতে টালি খুলে অ্যাসবেস্টর চাপানো হয়েছে। মনিহারির মালিক আজকাল সবরেই দোকান বন্ধ করে। ময়রা দোকানের গা ঘেঁষে ভ্যান ঠেকিয়ে ইন্দা সিটে বসে গুনগুন করে গান করছে। গানটা বোঝা যাচ্ছে না ঠান্ডায় ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাঘের শেষ শীত। দিনের বেলা ভালই গরম। রাতে হঠাৎ এরকম ঠান্ডা পড়বে সে বুঝতে পারেনি। একটা সাদা পাতলা টেরিলিনের জামা ইন্দার গায়ে। হাইওয়ে দিয়ে হুস্ হাস্ গাড়ি যাচ্ছে। হেড লাইটে বোঝা যায় একটা মানুষ; না হলে মনে হয় একটা সাদা জামা অনেকটা কাকতাড়ুয়ার ভঙ্গিতে বসে।

দু-একটা ঝর্ ঝরে বাস মাঝে মাঝে থামছে। কোলকাতা থেকে লোকজন নামছে। শনিবারের রাত।

সারা সপ্তা কাজ করে ফিরছে। ভ্যান পেলে তাদের সুবিধা হয়। কিন্তু ইন্দা তাদের নেবে না। প্যাসেঞ্জার খাটতে তার লজ্জা। ভ্যান চালালেও লোক বয়াতে নাকি ইজ্জোৎ থাকে না। লোকে ভ্যানওলা বলবে। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে ইন্দা। এ অঞ্চলে সেটুকুও অনেকে পড়েনি। ইন্দার ভ্যান নিজের কেনা। কারও থেকে ইজারা নেওয়া নয়। তার আত্মসম্মান বোধ গভীর। তার সহপাঠীরা অনেকেই বড় বড় চাকরি করে এবং এখনও তাকে ডেকে কথা বলে। সেটাই তার সম্মান বাড়িয়ে রাখে অনবরত। খুব ভোরে উঠে সে দু-এক টিপ ইমারতি মাল মশালা বয়ে দিনের খরচ তুলে নেয়। বাকি সময়টা তার মাছের নেশা। শনিবার রাতটা নকুল কাকার জন্য মোড়ে আসে। নকুল কাকা তাকে খুব স্নেহ করে। কুশে খোঁড়া। একটা পায়ে জোর কম। সম্ভবত ছোটবেলায় পোলিও হয়েছিল। তার ভ্যান কেনার সময় অনেকগুলো টাকা ধার দিয়েছিল। এখনও চায়নি। সেই কৃতজ্ঞতায় ইন্দা প্রতি শনিবার আসে। নকুল কাকা অবশ্য ভ্যান ভাড়া বাবদ যা দেয় তাতে রবিবারের সকালের বাজারটা হয়ে যায়। নকুল কাকার শিয়ালদায় সব্জীর ফোড়ে ব্যবসা। উপরী লাভ রাস্তার পাশে ভ্যান ঠেকিয়ে বাংলা অথবা ইংরাজী। নকুল কাকাই পকেটে করে আনে কোলকাতা থেকে।

রবিবার ভোর থেকেই পবনের পুকুর ছেঁচায় লেগে যায়। কাল রাতেই কাজটা পাকা করে নেয় ইন্দা। নকুল কাকার জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় পবনের অনুরোধ ফেলতে পারে না। পবন তার প্রাইমারী স্কুলের বন্ধু। এখন হাইস্কুলের মাষ্টার। দুটো জেলা ডিঙ্গিয়ে স্কুল। শনিবার রাতে ফেরে আবার সোমবার ভোরে বেরিয়ে যায়। রবিবার খানসামা বিল্ডার্স বন্ধ থাকে। সকালটা ফাঁকাই থাকে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত নকুল কাকার জন্য অপেক্ষা করেও ফেরেনি। হয়তো শিয়ালদায় কাজের ফেরায় আটকে গেছে। মন খারাপ করে নকুল কাকার সঙ্গ হারানোর। তবু ভালো পবনের পুকুরে মাছ ধরার কাজটা পেয়ে যাওয়ায়। খাওয়ার মাছ পাওয়া যাবে। আর পবনের হাত লম্বা। ভাল ইনকাম করে। মাইনের থেকে বেশি নাকি ছেলে পড়িয়ে আয়।

মাঘের শীত বাঘ জব্দের ঠান্ডা। রাত আড়াইটে থেকে পুকুরে নেমে আছে। জল কমিয়ে জাল টেনে পোনা মাছ তুলে দিয়েছে চারটের আগেই। সে মাছ নিয়ে মাছ গোলায় বিক্রি করে ফিরে এসেছে ভুলু আর বোকো। ইন্দা সেই যে পাঁকে নেমেছে মাছ ধরতে আর ওঠেনি। একটা তিজেল হাঁড়ি আর নম্পর নিয়ে মাছ ধরেই চলেছে। মাছ বলতে খোলসে, শিঙ্গি, মাগুর, সোল, কই, ল্যাটা। দু একটা বড় বড় ন্যাদস মাছও পাচ্ছে। হাঁড়ি বোঝাই হলে শুধু পাড়ে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে ইন্দা। পবন পাড়ে বসে আছে সেই রাত থেকে।

ডান হাতে তিজেল হাঁড়ি আর বাম হাতে নম্পর নিয়ে আর একবার পাঁকে মাছ খুঁজতে নামার আগে একটা বিড়ি খেতে ইচ্ছা করে ইন্দার। লুঙ্গির গেঁটে থেকে বিড়ি খুঁজে ধরাতে গেলে পবন ইন্দাকে একটা ধপধপে সাদা সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। বেশ সম্মান লাগে ইন্দার। তবু সে পুরানো সঙ্গীকে বলে, নে তুই আগে দুটান মার!

সিগারেট খেয়ে ইন্দা আবার মাছ ধরতে পাঁকে নামে। সেই বেঁটে খাঁটো মানুষ। পুকুরটায় পাঁকও গভীর। বহুদিন কাটানো হয়নি। ইন্দার প্রায় উরু পর্যন্ত গেঁথে যাচ্ছে। ঠান্ডায় এখন যেন জমে যাচ্ছে বেশি বেশি। সিগারেটটার গরম কি তাকে বেশি ঠান্ডাপ্রবণ করে দিল, ভাবে ইন্দা। তবু তার মাছ ধরার খামতি নেই। লোকে তাকে এমনি এমনি এঁশো পেতি বলে না। মাছ দেখলেই তার চোখ চক্ চক্ করে ওঠে ! ঠান্ডায় উরুর সব পেশি আলাদা আলাদা করে অনুভব করছে সে। মনে হচ্ছে চামড়ার ভেতরে পেশি গুলোয় বরফের কুঁচি

জাপটে ধরে আছে। উরু গেঁথে গিয়ে লুঙ্গি টপকে বরফ কুঁচির ঠান্ডা স্পর্শ করে তার গভীর অন্তস্থল।

তবু আরও এক হাঁড়ি জিওল মাছ নিয়ে পাড়ে উঠে আসে ইন্দা। ততক্ষণে আলো ফুটে উঠেছে। আর আলোর জন্যই সে নম্পরের কথা ভুলে গেছে। কোথাও রেখেছিল ডুবে গিয়ে থাকবে পাঁকে। খুব ছোট লাগে পবনের কাছে নিজেকে। সে জানে বাড়ির বৌরা এই সব ছোট খাঁটো সংসারী জিনিষ হারালে খুব অশান্তি করে। পবন কিছুই বলে না। সে হিসাব করছে মাছের দামের। জিওল মাছের অনেক দাম। আশাতীত মাছ ধরে দিয়েছে ইন্দা। ছোট বেলার সহপাঠী। তার কাছে খুব গরীবই। পবন ইন্দাকে আশ্বস্ত করে করে ল্যাম্পের ব্যাপারে।

- তোকে ওনিয়ে ভাবতে হবে না। তুই মাছ নিয়ে বাড়ি যা। বিকালে দেখা করিস।

ইন্দা বোঝে বিকালে দেখা করতে বলছে টাকার জন্য। মনে মনে চিন্তা করে আজকের বাজার হবে কী করে! তবু সে টাকার কথা মুখ ফুটে বলতে পাবে না। সে অন্য কথা বলে, পবন পুকুরে আরও মাছ আছে রে! একটু জিরিয়ে সব ধরে দিচ্ছি। আর আমি এখন বাড়ি না গেলেও চলবে। আসলে ইন্দা খালি হাতে বাড়ি যেত চায় না পবন বুঝতে পারে। সে টাকা আনতে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

- আরে ছাড় না বিকালেই দিস। আমি এখন মাছ কটা

ধরে দিই।

- ইন্দা আর মাছ ধরতে হবে না। যদি ধরতে চাস তুই মাছগুলো নিস।

- ধুস ! কী যে বলিস তুই।

- ইন্দা যত ইচ্ছা মাছ ধর; ধরে জাবিয়ে কাল ভোরে আড়তে দিস। যা টাকা হবে সেই দিয়ে মাছের ব্যবসাই করিস। পবন হাসতে হাসতে বলে। সে জানে ইন্দা লোভী না; মানুষ হিসাবে অনেক খামতি নিয়েও অসম্ভব সৎ।

এঁশোপেতি ইন্দা মাছ ব্যবসা শুরু করে। মাছ ধরায় তার অখণ্ড উৎসাহ। জলের ভেতর মাছের পাখনা নাড়া দেখে বলে দেয় সে কী মাছ। ঘাই মারা মাছের ওজন বলে দেয় অনায়াসে। ছিপ তার প্রিয় সঙ্গী। ঘন্টার পর ঘন্টা একমনে তাকিয়ে থাকতে পারে ছিপের চুঙির দিকে। মাছের চার বানাতে ওস্তাদ। রুই মৃগেলের চারে একাঙ্কি, নারকেল পচা, জয়িত্রী আর কাতলা মাছের টোপ মিহিন চালের হাঁড়িয়া, বিলিতি মদের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে মখনের গাদ। আর ইন্দার বাড়িতে চাল থাক বা না থাক মাছের টোপের জন্য ছোলার ছাতু আর পিঁপড়ের ডিম সব সময় মজুত। জিওল মাছের আবার অন্য চার চাই। গন্ধওলা চার। শুকোমাছ আর নারকেল পচার গন্ধ তাদের প্রিয়। এসব ইন্দা কাউকে শেখায় না। মন্ত্র গুপ্তির শফৎ তার ওস্তাদের কাছে। কাতলা মাছ ভাসা মাছ। সে বঁড়শির খাদ্যের লোভে আসে না। হাঁড়িয়া আর ছাতু জলে মিশে গিয়ে এক রকম তেল ছাড়ে। সেই তেল জল থেকে আলাদা করে টেনে নিতে যায় কাতলার বড় খাবি। আর তাতেই কাঁধি বড়শি গেঁথে যায় বড় বড় কাতলার নথ্ পরা ঠোঁটে।

ইন্দা মাছের ব্যবসা কখনও করেনি। সে মাছ কিনে কখনও বিক্রি করেনি। সে মাছ ধরে পচা ডোবায়, খালে, বর্ষার মাঠে। ধরা মাছ নিজে খায়, পড়শিকে দেয়। আর কখনও কখনও খুব বেশি মাছ পড়লে গ্রামে বৌ বিক্রি করে দেয়। ইন্দার মাছ বিলানো তার বৌ বড় একটা পছন্দ করে না। অভাবের সংসারে দুটো পয়সাও তার বউয়েরর কাছে মহার্ঘ। তবু সাদেকা বিবি বেশি কিছু বলে না। বড় মায়া লাগে মরদের মাছ ধরার নিষ্ঠার প্রতি। অভাবটা সে মেনে নিয়েছে। আর তার অন্য রকম মরদটাকে সে মানিয়ে নিয়েছে।

পবনের পুকুরের জিওল মাছ বেচে ইন্দা মাছ ব্যবসার মূলধন করে। শেষ বারের মতো আন্তরিক দিয়ে আসতে চেয়েছিল পবনদের মাছগুলো। পবন নেয়নি। বিকালে ইন্দাকে পবন মাছ ধরার টাকা দিতে এলে ইন্দাও প্রত্যাখ্যন করে তা। খুব ছোট বেলার জীবনে দুজন ফিরে যায় চা দোকানের বেঞ্চে চা খেতে খেতে। ইন্দার মনে হয় তার নসিব খুলবে এবার। ওপরওয়ালা মুখ তুলেছে।

প্রথম দুদিন আড়ৎ থেকে ইন্দা অন্ধ্রের কাটা পোনা তোলে। অল্প কয়েক কয়েক পাল্লা মাছ তুলে বসে বাস স্ট্যান্ডের কলাগাছের ভেতরেই পলিথিনের সিট্ বিছিয়ে। এ অঞ্চলের লোক জন সকালে বাজার করতে যেত বাসস্ট্যান্ড দিয়ে আরও কয়েক কিলোমিটার দূরে মুন্সির হাটে। বাসস্ট্যান্ডে ইন্দার মাছ পেয়ে আর যায় না। ইন্দার থেকেই মাছ কিনে বাড়ি ফেরে। নতুন দোকান, ইন্দাও নতুন দাঁড়ি পাল্লায় একটু ঝুকিয়ে মাছ মাপে। নতুন দাঁড়ি পাল্লায় ওজনে বেশি মাছ পেয়ে লোকজনও খুশি। সকালের রোদ ভালো করে তাই ফুটতে না ফুটতে ইন্দার মাছ বিক্রি হয়ে যায়। অনেকে মাছ না পেয়ে মুন্সির হাটেই মাছ কিনতে যায়।

ইন্দা শুক্র -শনিবার মোটামুটি ভালই লাভ করেছে। সে এবার বড় করে ব্যবসার পরিকল্পনা করে। শনিবার বিকালে নিজের ভ্যানটা বন্ধক রেখে রবিবার সকালে বেশি করে মাছ তোলে। মোন খানেক কাটা পোনা নিয়ে বসে ভোরবেলায় বাসস্ট্যান্ডের কলাগাছের গোড়ায় বড় পলিথিন বিছিয়ে। গত দুদিন যা খদ্দের সে দেখেছে রবিবারের বাজারে অনায়াসে বিক্রি হয়ে যাবে। আজকের লাভেই বন্ধক দেওয়া ভ্যান বিকেলেই ছাড়িয়ে নেবে। সেভাবেই সে চড়া সুদে তার বুড়ো ভ্যান বন্ধক দিয়েছে। কলা গাছ থেকে টুপটাপ করে শিশির পড়ছিল সকালে। এখন শিশির টপা থেমে গেছে। মাঘের শীত কেটে রোদ উঠেছে বেশ তেজি। মাছের উপর ভনভন করে জমে বসেছে ডাঁস মাছি। ইন্দা গামছা দিয়ে মাছি তাড়ায়। অপেক্ষা করতে করতে বেলা মাথায় ওঠে। খুব অল্প মাছ বিক্রি হয়েছে। যে কজন এসেছিল সব মুসলমান খদ্দের। কী হল সে বুঝতে পারে না। মাথা তার ঘুরে পড়ার দশা।

একটু পরেই যোহরের আজান শুনতে পায় দূরের মসজিদ থেকে। বুড়ো ইমামের ভাঙ্গা গলা। তখনই বাসস্ট্যান্ডে আসে পবন। শীতের মিঠে রোদে বউ বাচ্চা নিয়ে কোথাও বেরিয়েছে। এগিয়ে আসে ইন্দার কাছে। কীরে ইন্দা আজ এতো মাছ তুলেছিস কেন ? জানিস না কাল শনি ঠাকুরের বার ছিল। আজ এ তল্লাটের লোকজন নিরামিষ খাবে!

# মধুমালতী

**নরেশ মণ্ডল**

অনেকটা পথ যেতে হয় মধুরিমাকে। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধা হত। জায়গাটাও নতুন। কোনও দিন ওই দিকে যায়নি সে। বাবার সঙ্গে প্রথম ক'দিন গিয়ে জায়গাটা চিনে নিয়েছিল। অনেকগুলো যান তাকে নিয়ে যেত গন্তব্যস্থলে। জায়গাটা মন্দ লাগেনি। গ্রাম। তবে অজ পাড়াগাঁ বলতে আমরা যা বুঝি এই জায়গাটা সেরকম নয়। নামটাও খুব সুন্দর। মধুমালতীপুর। কালো রাস্তাটা দু'ধারের ধানখেতের বুক চিরে যেন চলে গেছে। রাস্তার গা ঘেঁসে চলে গেছে নয়ানজুলি। বর্ষাকালে দুধারে জল থাকে। কোথাও চওড়া জলাভূমিতে দেখেছে শালুক ফুল। খুব মনোরম লাগে মধুরিমার। ছবির মতো। কোন শিল্পীর দক্ষ হাতের কাজ। এক এক দিন মনে হয় মাঝপথে নেমে পড়ে। নয়ানজুলি পার হয়ে ধান ক্ষেতের মধ্যে হারিয়ে যায়। আলপথও আছে।

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা হয়ে অদৃশ্য অপুর পেছন পেছন চলে যাবে অনেক অনেক দূর। হয়তো সেও এক সময় রেললাইন, রেলগাড়ি দেখতে পাবে। কু ঝিক ঝিক শব্দ এখন আর পাবে না। এখন তো বৈদুতিন হর্ন। তীব্র শব্দ। গতিও অনেক। সময় যে পালটে গেছে। মানুষের মনও কেমন যেন বর্ণহীন যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে।

মাঝে একটা জায়গা পড়ে মাদারিহাট। এখানে রাস্তাটা উটের কুঁজের মতো অনেকটা উঁচু হয়ে নেমে গেছে দক্ষিণ দিকে। নীচ থেকে ওঠার সময় গাড়িগুলোকে অনেকটা উঁচুতে দেখায় যেমন সমুদ্রের উপর জাহাজকে শেষ বার দেখা যায় উপর থেকে নেমে আবার হারিয়ে যায়। ভ্যানরিকশায় নামার সময় বেশ লাগে। প্রথম প্রথম ভয় লাগত উলটে যাবে না তো। অন্যরা ওর ভাব দেখে বলে, ভয় নেইগো নতুন দিদিমণি। কিচ্ছুটি হবে নে। তুমি শক্ত

করে কাঠটা ধরে থাক। আমরা ছাবালদের নে যাতায়াত করি। মধুরিমা ভ্যানরিকশার ফাঁক ফাঁক বাটামগুলোর একটা শক্ত করে ধরে রাখে। এখন আর তেমনটা মনে হয় না। অভ্যাস থেকে অভিজ্ঞতা। সঞ্চয় বাড়ে। জীবনের অনেকগুলো বছর পার করে ফেলল সে। সেই কবে প্রথম বাবার হাত ধরে মাথার দুপাশে বিনুনি ঝুলিয়ে স্কুলে গিয়েছিল। সে কি কান্না। মাও গিয়েছিল প্রথম কদিন। মা ছাড়া কে পারত ওর কান্নাভরা মুখে আবার হাসি ফোটাতে। বাবা স্কুলের গেটের কাছে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। তারপর মার দায়িত্ব ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটাকে শান্ত করে স্কুলের সদর দরজা পার করিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া। তার পর বাবা চলে আসত। মা বসে থাকত। গাছের তলায়। কোনও বাড়ির গাড়িবারান্দার নীচে। আরও অনেক মা থাকত। প্রথম কিছুদিন এটাই ছিল প্রাথমিক রুটিন বাবা-মার। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের কোনাটা মোছে। আজ সে কত বড় হয়ে গেছে। গার্লস স্কুলের দিদিমণি। ছাত্রীদের প্রিয় দিদি। কত দূর রাস্তা ঠেঙিয়ে স্কুলে আসে। ওর অনুপস্থিতি ওদের কাছে মাটি হওয়া একটা দিন। সচরাচর এমন ছাত্র-ছাত্রী এখন বড় একটা চোখে পড়ে না। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সবাই ছোট ছোট গ্রুপের মধ্যেই বন্ধুত্ব সীমায়িত। অন্যের দিকে সে ভাবে ঘুরে দেখার সময় তো চাই। সেটা পাচ্ছে কই। দেখা হলে মৃদু হাসি। দৃঢ় হয় না পরিচিতি। ছাড়া ছাড়া ভাব সর্বত্র।

- কই দিদিমণি নামবেন তো?

- আরে তাই তো।

ভাড়াটা মিটিয়ে হন হন করে পা চালায়।

- ও দিদি তুমিতো বেশি পয়সা দিলে। নে যাও।

ডাকে কাদের শেখ।

হাঁটতে হাঁটতে মধুরিমা বলে- তুমি এখন রেখে দাও। ফেরার সময় হিসেব করে নিও।

- ঠিক আছে, ঠিক আছে তুমি যাও। না হলে দেরি হয়ি যাবে। কথাটা বলে কাদের শেখ ভ্যানটা রাস্তার ধারে এক পাশে এবড়ো-খেবড়ো ঢালে দাঁড় করায়। টিউকলের জলে হাত মুখ ভালো করে ধোয়। জায়গাটা বাঁধানো। কলসি বসানোর জন্য উচু করে খোবরানো করা। যাতে মাটির কলসি উলটে না ভাঙে। গরিবগুর্বোর বাস। কজনের বাড়িতে আর তামা-পিতলের কলসি আছে। ছেলে ছোকরারা ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বালতি টিউকলের নলটার গায়ে ঝুলিয়ে দেয়। ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ তুলে জল ওঠে। কখনও জল আবার ওঠেও না।

তখন পুকুরের জল খানিকটা টিউকলের মাথার ফাঁক দিয়ে ঢেলে দেয়। একজন দু'হাত দিয়ে কলের মুখটা চেপে ধরে। যাতে জল বেরতে না পারে। হ্যান্ডেলে চাপ দিলে জল বের হয়ে আসে। বাচ্চাকাচ্চাগুলো জল ঢালে, হুড়োপাচরা করে। বাপ ঠাকুর্দারা এলে চিৎকার করে, যা পালা। কটা বাজে। স্কুল নেই তোদের। গা মুছে এবার পাঁই পাঁই দৌড়। প্যান্ট জামা গলিয়ে চাটাই পেতে খেতে বসে। খাওয়া শেষে দৌড় দৌড়। কোন ছেলের জামার বোতাম খোলা। কারো স্কার্টে সেপটিপিন। কারো কাঁধে ঝোলা। কারো সুটকেস। পায়ে প্লাস্টিকের বা হাওয়াই চটি। ছুটির পর জলতরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ত সবাই।

গামছাখানা কাঁধ থেকে টেনে ভালো করে হাত মুখ ঘাড় গলা মুছতে বেশ আরাম লাগে। পাশের দোকানে বাঁশের বেঞ্চে গিয়ে বসে কাদের শেখ। একটু চা খেতে মন চায়। দোকানি নটবর কাঁড়ার কাছে এসে বলে, কি মিয়া চা হবে নাকি একটু।

- সেই রকমই ইচ্ছা নটবর ভাই।

- সেটা তো বলবে না কি।

- বলব বলব ভাবছিলাম।

- ভাবনা শেষ হলে না হয় বলো কাদের ভাই। ওদিকটা সামলাই ততক্ষণ।

- পেটের মধ্যে ভাবনাগুলো রেখে দিলে কি করে চলবে। যা দিনকাল পড়েছে কাদেরদা। মুখ খুললেও বিপদ। না খুললেও তো সেই একই অবস্থা।

- তা যা বলেছো ভাই। সাধারণ মানুষগুলোর কথা কে ভাববে জানি না। আমরা কিচ্ছুটি বুঝি না! ম্যাট্রিকটা তো পাস করেছি। নটবর তুমি না হয় আমার থেকে একটু বেশি পড়েছে। সবাইকে আকাট মুখু ঠাওরালে হবেনি। এটা ভালো হচ্ছে না গো। বিকাল শেষে তোমরা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালো, ধূপ দাও। আমরা নমাজ পড়ি। নমাজে যোগদানের জন্য আজান হয়। তেমনি আমরা টিভি দেখি, রেডিও শুনি। এখন হাতে হাতে ঘুরছে মোবাইল ফোন। আমরা তো বিজ্ঞানকে সরিয়ে রাখিনি। অথচ ভাগাভাগির কত রকম চেষ্টা চলছে।

- কাদেরদা তুমি সত্যি কথাই বলেছে। মানুষের বড় শত্রু মানুষই। দেখছো তো মুখে এক কাজে অন্য। কেমন যেন অচেনা লাগে এইসব মানুষদের। মেলাতে পারি না এদের জানো কাদেরদা। যাকে পরিচিত জানি সেই একদিন অপরিচিত হয়ে ওঠে।

- তা ঠিক বলেছ নটবরদা। কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে আসে সফিউদ্দিন। পেছন পেছন রমেশ। বলে, তা একটু চা হয়ে যাক... মেরির সঙ্গে। বিজ্ঞাপনের ঢঙে। ওর কথায় সবাই হেসে ওঠে। অংশু সবাইকে চা দিয়ে যায়।

- চা আমি খাওয়ালাম। তোমাদের পয়সা দিতে হবে না। বলে নটবর কাঁড়ার।

- ঠিক আছে বিস্কুট দাও। এর দাম আমি দেব। অংশু

দুটো করে বিস্কুট দাও তো। নটবরদা তুমিও খাবে কিন্তু। না বলতে পারবে না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে ভাই রমেশ। তোমার কথা রাখছি। অংশুর থেকে একটা বিস্কুট তুলে নেয় নটবর। কাচের গ্লাসে চুবিয়ে মুখে দেয়। স্বস্তির হাসি মুখে। ভালোবাসা। এমনটা চাই।

ধীরে ধীরে বেলা নামে গাছের ছায়ায়। যে যার বাড়ির পথে। দোকান বাজার গুটিয়ে গেছে। কাদের শেখ ভ্যানরিকশা নিয়ে উঁচু নিচু এবড়ো-খেবড়ো ইটের রাস্তা দিয়ে এগোয় বাড়ির দিকে। এদিকটায় এখনও ঘর হয়নি। দুপাশে ধানী জমি। ধান কাটা হয়ে গেছে। পড়ে আছে নাড়া। সময়ের ফাঁকে বউ-ঝিরা কাস্তে নিয়ে নেমে পড়ে মাঠে। এ রাস্তাটা সোজা চলে গেছে মণি নদীর দিকে। কাদের এবার বাঁদিকে মোড় নেয়। এ পথে কিছুটা এগোলে ওদের গ্রাম মোল্লাপাড়া। তারপর মাঝের গ্রাম। তারপর উত্তরপাড়া। রাস্তার ধারের বাড়ির উঠোনে বিচালি ছড়ানো। রোদে ভালো করে শুকিয়ে নেয়। যাতে জ্বালানিতে কোনও অসুবিধে না হয়। ভালো খড় রাখে গোরুর জাবনা দেবার জন্য। নাড়াগুলোও এই ভাবে খটখটে করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। কোনও বাড়ির উঠোনে ধান সিদ্ধ করার বড় বড় উনুন। মুরগির ছানাদের ঘুরে বেরানো। কারো উঠোনে গোরু বাঁধা। পেছনের দেওয়ালে ঘুঁটে। তাল গাছেও দেয় কেউ কেউ। কোথাও রাস্তা লাগোয়া জায়গায় গোরু। বেড়ার গা ঘেঁষে খোটায় বাধা ছাগল। খড়ের চালে ঘুঘুর ডাক। হর্ন দিতে দিতে পথটুকু পার হয় কাদের। পুকুরে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে চলে। কেউ বাসন নিয়ে ঘাটে গেলে কাছে এসে ডেকে যায়। পুকুরের পাড়ে রাখা মালসা। এখানে খাবার দেয় মণিমালা, পুন্যি পিসি, সুরবালারা। দল বেঁধে উঠে আসে অনর্গল প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজে। মালসার আশপাশ ছড়ানো বিষ্ঠায়। সুরবালা খাবারটা মালসায় ঢেলে একবার আয় আয় চই চই বলতেই প্যাঁক প্যাঁক শব্দে হুড়মুড়িয়ে উঠে এল সব।

কাদের শেখ হর্ন বাজিয়ে ডাঁয়ে বাঁয়ে করে বাড়ির উঠোনের এক কোণায় ভ্যানরিকশাটা দাঁড় করায়। মেয়ে পারভিন দৌড়ে আসে। আব্বাজান আমার কথাটা মনে আছে তো। নাকি ভুলে বসেছ। মেয়েকে দুহাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয়। হ্যাঁ রে মা মনে আছে। এটাই তার সবচেয়ে ছোট সন্তান। বড়টা ছেলে রহমান। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। ইংলিশে অনার্স। মেজ মেয়ে রোকেয়া মাধ্যমিক দিয়ে সায়েন্স নিয়ে ইলেভেনে পড়ছে। ছোটো পারভিন সামনের বছর দুপুরের স্কুলে ফাইভে পড়বে। রোকেয়া শহরের দিদিমণির স্কুলে পড়ে। এই শহরের দিদিমণি গ্রামের সবার কাছে নতুন দিদিমণি থেকে গেল।

নতুন দিদিমণি খুব ভালো গান গায়। সে বছর প্রথম এসেছে কুমুদিনী বিদ্যামন্দিরে। সবাই চেপে ধরল। বড়দি তো সবার সামনেই বলে দিলেন - "তুমি ভালো গান জানো। আর সেটা তোমার বায়োডাটাতেই দেখেছি। তুমি তো এখন বলতে পারবে না। সবার যখন ইচ্ছে তোমার গান শোনার তখন না বলতে পার না। কি বল মধুরিমা।"

একটা জাঁতাকলে আটকে গেল মধুরিমা। সে চায়নি গানের কথাটা এখানে চাউর হোক। এই গান থেকেই তার জীবনে পরিবর্তন ঘটে যায়। মাঝে বেশ কিছুদিন গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। মনমরা মেয়েকে কোন মা-ই বা দেখে চুপ থাকতে পারে। সুদীপা মনকে স্থির করে কাছে ডাকে মেয়েকে।

- রিমা তুই বোধ হয় ভুলে যাচ্ছিস ফেলে আসা দিনগুলোর কথা।

- কেন মা একথা বলছ !

- তুই এখন এটা কি করছিস।

- আমি আবার কি করলাম! গান গাইতে আর ভালো লাগে না। তাই গাই না। এতে সমস্যা কোথায়!

- সেই জন্যই তো বললাম তুই সব ভুলে গেছিস। না হলে গান বন্ধ করে দিতে পারিস। সে দিনের কথা মনে করতো। তোর বয়স কত। কোন ক্লাসে পড়তিস।

- সিক্স না সেভেন। তাইতো। তোর বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরদিনের জন্য। তখন আমি দিশেহারা। দিন রাত এক করে খালি খেটে গেছি। মাথায় তখন একটাই চিন্তা। কি করে তোকে বড় করব। তোকে গান শিখিয়েছি, তুই ভালো আবৃত্তি করতিস। গান আবৃত্তিতে কত পুরস্কার পেয়েছিস। স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। আর আজ তুই সেই গান বন্ধ করে দিতে চাইছিস। আমি মা হয়ে তোর এই অবস্থা নিশ্চয়ই ভালো চোখে দেখতে পারি না।

আমার কথা শোন। তুই মন দিয়ে গান কর। গানে ডুবে থাক। পাস করে গেলে তো তোর স্কুলে একটা চাকরি হয়ে যাবে। তখন মনটা অনেক হালকা লাগবে।

মায়ের সেই কথা ফেলতে পারেনি। নিজেকে স্কুলের পরিবেশে মানিয়ে নিতে পেরেছে। আজ সে সবার প্রিয় নতুন দিদিমণি। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে প্রথম প্রকাশ্যে গাইল। তার গায়কী, গান নির্বাচন ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবক সকলের মন জয় করে নিল। সঙ্গীতজ্ঞ বয়স্ক মানুষজনের বুঝতে অসুবিধে হল না যে, মধুরিমা নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা করে। না হলে এভাবে গাওয়া যায় না। গানের ছাত্র-ছাত্রী জুটে গেল অনেক। কাউকে ফেরাতে পারে না সে। স্কুলে এবং বাইরেও তাকে গানও শেখাতে হয়।

কয়েকজন ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সে হাজির

হয় কাদের শেখের উঠোনে। পুকুরে বাসন মাজা ছেড়ে উঠে আসেন কাদেরের স্ত্রী। নতুন দিদিমণি এদিকে কাদের বাড়ি যাচ্ছে। নিজের উঠোনে যেতে দেখে কাপড়ে ভিজে হাত মুছে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। দিদিমণি আপনি ! রোকেয়া কিছু করেছে। একটা উদ্বেগ লক্ষ্য করে মধুরিমা।

- না না। ওসব কিছু না। আসলে সামনে ঈদ তো। তাই ছোটদের জন্য কয়েকটা জামা এনেছি।

- এসব করলেন কেন নতুন দিদিমণি।

- কেন আমি কি আমার ছাত্রীকে কিছু দিতে পারিনা।

- না, না। আমি সেভাবে বলিনি। আপনি কিছু মনে করবেন না।

ব্যাগটা ধরিয়ে দেয়। স্কুল আছে। চলি। বলে বের হয়ে আসে। কাদের তখনও ফেরেনি। ছেলে কলেজে। ছোট মেয়ে মায়ের কাছে।

কদিন স্কুল ছুটি। মধুরিমা কলিগদের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটা লাগায়। আগে ফিরতে পারলে অনেকগুলো কাজ সারতে পারবে।

- নতুন দিদিমণি। ও নতুন দিদিমণি। এদিকে এস।

মধুরিমা পেছন ফিরে কাউকে দেখতে পায় না।

- আমি এখানে। ডাকে কাদের শেখ।

- চাচা তুমি, দাঁড়াও আমি আসছি।

উঁচু রাস্তা থেকে নেমে আসে। বল চাচা কি হয়েছে। স্টেশন যাব তো চল।

- এই দেখ কে এসেছে।

- কে, চাচা তোমার ছোট মেয়ে। ঠিক বলেছি বল।

- তুমি ঠিক ধরেছো দিদিমণি। সামনের বছর থেকে তোমাদের স্কুলে পড়বে। কদিন স্কুল বন্ধ থাকবে তো। ও এসেছে তোমাকে ফুল দিতে।

পারভিন নতুন দিদিমণির হাতে ফুল তুলে দেয়। মধুরিমা গাল টিপ, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। আমি এবার ভ্যানে উঠি। পারভিন ঘাড় নাড়ে।

ভ্যানরিকশা এগিয়ে চলে। পারভিন হাত নাড়ে। মধুরিমাও হাত নাড়তে থাকে।

ভ্যানরিকশা এগিয়ে চলে।

# মেয়েধরা

## সুস্মেলী দত্ত

বিকেলের জলখাবারটা খেতে গিয়ে গা টা কেমন যেন ঘুলিয়ে এল মেনকার। দেশ থেকে ও কলকাতায় এসেছে মাত্র মাস ছয়েক আগে, এর মধ্যেই কাজের বাড়ির বৌদিমণির সঙ্গে ওর যেন কিরকম আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রথম প্রথম এই শহুরে জীবনটাকে বেশ ভয় পেত মেনকা, কিন্তু এখন সময়ের ফেরে ও অনেকটাই অভ্যস্ত ও সহজ সোমঋতার সঙ্গে। মন্দ লাগে না যখন মাঝেমধ্যেই অফিস থেকে হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় দয়ালু সোমঋতা যখন মেনকার শরীরের খবরাখবর নেয়, কিংবা ওর গ্রামের বর্তমান হালহকিকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাই শোধবাবদ মেনকাও ওর দেশের খাঁটি দেশজ রান্না খাইয়ে, আর কখনো দিদিমণির মাথা টিপে দিয়ে ওকে সকৃতজ্ঞ সারপ্রাইজ দিতেও ভোলে না।

সোমঋতা সিঙ্গল মাদার। এই 'একা মা' ব্যাপারটা মেনকার মাথায় এখনও বিলকুল ঢোকেনি। উল্টে কতবার যে ও সোমঋতার কাছে ওর নিরাবয়ব বর অর্থাৎ দাদাবাবুকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। শুধু তাই নয় মালকিনের মেয়েকেও অন্ততঃ একবার স্বচক্ষে দেখার তার বড় সাধ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দু দুটো স্বপ্ন আজ অবধি প্রায় অধরা। বৌদি বলে, ওর মেয়ে নাকি বিদেশে পড়াশোনা করে – তা হোক, কিন্তু তা বলে একদিনও কি অমন ফুটফুটে মেয়েটাকে নিজের বাড়িতে আনবে না সে? কে জানে বাবা! মেনকার গ্রাম্য কল্পনায় ভেসে ওঠে এক দুঃখিনী বালিকার প্রতিচ্ছবি, অনেকটা তার পুঁটির মতো দেখতে। পুঁটি এখন সবে ছয়ে পড়েছে। মা কলকাতায় আসার সুবাদে বাপমরা হতভাগা মেয়েটা এখন ঠাঁই পেয়েছে ওর মামার বাড়ির আশ্রয়ে।

যাক ছোটখাটো অভিযোগ, অস্বস্তিগুলো বাদ দিলে মেনকা এবাড়িতে এসে অবধি কিন্তু বেশ বিন্দাস আছে। ও যেন এখন এ বাড়িরই সর্বময় কর্ত্রী, আর মালকিন যেন ওর অতিথি। সংসারে যাবতীয় হিসেব নিকেশের দায়িত্ব ওরই হাতে।

আজ এই প্রথমবার বৌদিমণি রাতে ফিরবে না বলে গেছে। টেলিভিশনে হাজারগণ্ডা সিরিয়াল, সিনেমা, নাচাগানা সব এখন মেনকার নখদর্পনে, যখন তখন ফোন ঘোরালেই মেয়ের 'মা' ডাক শুনতে পায় সে, আর কি চাই? কিন্তু তবু আজ সকাল থেকে বিকেল এই দীর্ঘ সময়টা যেন আর কাটতেই চাইছে না। কোথায় যাবে সে? বহুতল আবাসনের অন্যান্য পরিচারিকাদের সঙ্গে বৌদির আদেশে কথা বলা বারণ, আর তাছাড়া মেনকার মা পইপই করে গ্রাম ছেড়ে শহরে কাজে আসার আগে বলে দিয়েছে যাতে সে একলা একলা শহরে না ঘোরাঘুরি করে। কারণ কলকাতায় নাকি বিস্তর ছেলেধরা আছে। এজন্য মা আবার তার কোমরে পীরবাবার তাবিজও বেঁধে দিয়েছে।

আজ ভাতঘুমের সময় মেনকা স্বপ্নে দেখল, বৌদিমণি রাক্ষুসীর মতো চোখ পাকিয়ে তাকে তাড়া করছে। সেই অবধি ঘুম ভাঙার অনেক পরেও গা গুলোনো অস্বস্তিটা যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে, কেন কে জানে!

দরজায় বারবার ডোরবেলের শব্দ। খুলতেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সাদা পোশাক পড়া জনাচারেক পুলিশ, তারপর কত কি প্রশ্ন, যার আদ্দেক কথার মানেই বুঝতে পারছে না মেনকা।

আপাততঃ হাজার স্কোয়ারফিটের খুপরি ফ্ল্যাটটায় ব্যাপক খানাতল্লাসী চলছে। এইসব দেখেশুনে মেনকা তো প্রায় ভয়ে সিঁটিয়ে বসার ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। অত সাধের সুসজ্জিত ঘরগুলো ক্রমশঃ যেন জঞ্জালে পরিণত হচ্ছে। এরকম দক্ষযজ্ঞ যদি বৌদিমণি এসে দেখে...

- বৌদিমণি এখন কোথায়? বুকটা কেমন যেন হু হু করে উঠল, কোনমতে সাহস সঞ্চয় করে ও জিজ্ঞেস করল,

- জেলে, একজন সাদা পোশাক গম্ভীর মুখে উত্তর দিল

- কেন?

- সোমঋতা সেন, নারীপাচারকারী

- মানে?

- মেয়েধরা

নিজের অজান্তেই কোমরের তাবিজটার দিকে হাত চলে গেল মেনকার।
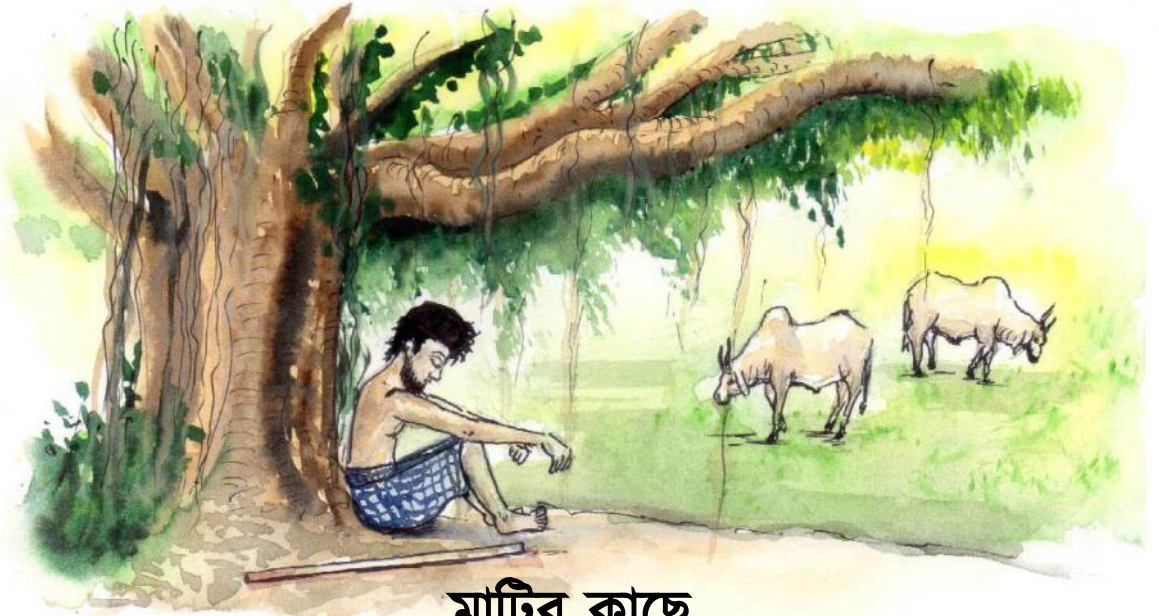
# মাটির কাছে

**রাজকুমার শেখ**

ঘন বট গাছটার নীচে এখন গভীর ছায়া। মাথার ওপর সূর্যটা টগবগ করছে। গরম কালে মাঠে কাজ করা যে কত কঠিন কাজ সেটা ভালো করেই জানে মালেক। চাষি পরিবারে জন্ম হলে যা হয়। তার পূর্বপুরুষও চাষবাস নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছে। তারও জীবন কাটছে মাটি নেড়ে। মাটির মতন আপন কে আছে এ জগতে? মালেকের কথা যেন শোনে মাটি। তার বুকে যে বীজ-ই পোঁতে সে তা সবুজ ডানা মেলে ফুঁড়ে ওঠে মাটি থেকে। ফুল দেয়। ফল দেয়। মালেক কখনও মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে দেয় তাদের সবুজ পাতাতে। যেন তার সন্তান। ওর আদরে ভরে ওঠে ফসলে। সে কখনও কখনও জমির মাটি মুঠো ভরে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকাই। যেন সে তার পিতৃত্বের ঋণ শোধ করছে।

মাটির গন্ধ মেখে এসে বসে বট গাছটার নীচে। বড়ই আরাম লাগে তার। মাঠ থেকে উঠে আসা ঝিরঝিরে বাতাসে তার গায়ের ঘাম শুকিয়ে আসে। চোখটাতে কেমন নিভু নিভু একটা ঝিমুনি ভাব। বট গাছটাই কত পাখি আশ্রয় নিয়েছে। তাদের চিকন গলার শব্দ যেন মনে হচ্ছে এই দুপুরে মোহন বাঁশি বাজাচ্ছে। মাঠের পাশেই সমাজের কবর স্থান। সেদিকে একবার চায় ও। মাঝে মাঝে কবরের পাশ দিয়ে গেলে তার দাদুর কবরটাকে সে লক্ষ্য করে। মনটা তার নিমিষে খারাপ হয়ে যায়।

দাদুর ঘাড়ে চেপে মেলা দেখার সাধ সে এখনো ভুলেনি। ওর দাদু তামাক সেবন করত। গা থেকে তামাক তামাক একটা গন্ধ সবসময় লেগে থাকত।

সে গন্ধ এখন সে আর পায় না। মনটা তার খারাপ করে কখনও সখনও। মানুষ এক জীবনে কত কী-ই হারিয়ে ফেলে। যা কোনো দিনই ফিরে আসে না। এই মাঠ ঘাট সবই পড়ে থাকবে। একদিন সেও চলে যাবে। এই কবর স্থানে কোথাও না কোথাও তারও কবর হবে।

তার এই মুহূর্তে জায়গাটা দেখতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সে জায়গা তো খোদা পাকই জানে। মালেক তাকিয়ে থাকে কবর স্থানের দিকে। ওর চোখে জল চলে আসে। কেমন একটা ভয় পায় সে। এই বাংলার মুখ সে আর কোনো দিনই দেখতে পাবে না। বিবির মুখ।

মালেকের দু'চোখ দিয়ে আপনা আপনি জল গড়িয়ে পড়ে। সে ভেতরে কেমন একটা কষ্ট অনুভব করে। আজকাল এমন চিন্তা তার আসছে। মাথা থেকে সে কিছুতেই চিন্তাটা বের করে দিতে পারছে না।

'কি-গো মিয়া, বাড়ি যাবা না? বেলা যে পড়ি আসছে'।

রাশেদের কথায় ওর চমক ভাঙে। রাশেদও তার মত চাষি। একই গ্রামে তাদের বাস। মালেকের ঘোরটা কেটে যায়। একটু সময় নিয়ে বলে, 'যাবোরে- রাশেদ। একটু ঢুলিনি মতো এসেছিল'।

'বাড়ি গিয়া ঘুমাও না। এখানে সে আরাম পাবা নাকি'?

'আরাম! আমাদের আরাম বলতে কিছুই নেইরে রাশেদ। এই গাছ তলায় সব'।

রাশেদ একটু মজা করে বলে, 'ভাবি বুঝি ঘর থেকে বের করে দিয়েছে'?

বলে হাসতে থাকে। গাছের পাখি গুলো সে হাসিতে

কেমন চুপ মেরে যায়।

আজ দুপুরটা কেমন অন্য রকম।

মালেক আর রাশেদ এক সময় বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

দুই

আজ ওর ঘুম ভাঙছিল না। মালেকের বউ বার কতক ডেকে গেছে। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। মালেক নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে আজ যেন তার কোনো তাড়া নেই। মানুষকে তো একটা সময় এসে থামতেই হয়। যাবতীয় কর্ম শেষ হয়। দুনিয়াদারি কথা ফুরিয়ে যায়। দেহ পড়ে থাকে মাটির শেষ আশ্রয়ে!

যে ডানায় ভর করে জীবন বাতাস উড়ে যায় সে পাখি কেউই দেখেনি। ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। হায়রে জীবন!

মালেকের মুখের ওপর সকালের নেক রোদ এসে পড়েছে। মুখটা দেখে মনে হচ্ছে নতুন একটি শিশুর মুখ।

উঠোনে ঝাঁট দিতে দিতে নয়নতারা সেদিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষটির বড়ই খাটুনি। 'থাক ঘুমিয়ে'। মনে মনে বলে কথাটা নয়নতারা।

নয়নতারা কাজে মন দেয়। ওদের বাড়ির উঠোনের একপাশে নিম গাছটাই একটা পাখি একটানা ডেকে চলেছে। ডাকটা বড়ই মধুর। নয়নতারা কান পেতে শোনে। ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। স্কুলের কদম ডালে অমনি ডাকত পাখি। পাখি ডাকলেই স্কুলে আর মন টিকতো না। কেমন একটা উড়ো উড়ো ভাব। জানালা গলিয়ে মন পালাতো দূর খেতের পারে। নয়নতারার পড়ায় মন বসত না। অনেকদিন পর পাখিটা তার ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দিল। ওর মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। নয়নতারা তার ছোট বেলায় ফিরে যায়। দুপুরে পালিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কিতকিত খেলা আর পরের গাছের পেয়ারা চুরি করা এখনও তার মনে আঁক কাটে। নদীর বুকে নৌকো করে ভেসে বেড়ানো। মাছরাঙা দুপুর যেন এখনও মনে ঝিলিক দেয়।

যত বয়স হচ্ছে ততবেশি পুরনো দিনগুলি মনে পড়ছে। নয়নতারা কাজ ফেলে গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে। পাখিদের গাছ এখন হারিয়ে যাচ্ছে। এদেরও আশ্রয় চায়। নয়নতারা কষ্ট হয় এসব ভেবে।

একসময় ঝাঁট দেওয়া শেষ করে মালেককে ডাকে। মালেক উঠতে চায় না। সে মাঠের কাজ আজ ভুলে গেছে। ওদের কোনো সন্তান আদি নেই। তাই নয়নতারা মনে মনে কষ্ট পায়। তবে তা নিয়ে মালেকের কোনো ভাবনা নেই। তার সন্তান বলতে বলদ জোড়া। মাঠে লাঙল দিতে দিতে তার জীবনের অনেকখানিই ক্ষয়ে ফেলেছে। এ জীবনে তো ফসল আর কম ফলায় নি। তাই তার মনে কোনো কষ্ট নেই। খেতের পাশে দাঁড়ালে তার সন্তানরা মাথা হেলিয়ে ওর কথার উত্তর দেয়। ফসল তার জীবনের স্বপ্ন।

নয়নতারাকে যখন রাতে আদর করে তখন মানুষটির গা থেকে কেমন সবুজ সবুজ গন্ধ বের হয়। নয়নতারা বিভোর হয়ে সে গন্ধ নেয়। মালেকের গা ঘেঁষে সে শুয়ে থাকে। যেন দু'টি নদী।

নয়নতারা মালেকের পাশে বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সকালের রোদে মাটির গন্ধটা ছড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। নয়নতারা আলতো করে মালেকের কপালে হাত রাখে। রোদ বাড়তে থাকে। পাখিটা আবার ডেকে ওঠে।

তিন

দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মালেক চাষ শেষ করে এসে বসেছে বট গাছের নিচে। আয়াসী বাতাস দিচ্ছে। ওর অন্তর জুড়িয়ে যাচ্ছে সে বাতাসে। গত কাল থেকেই তার শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছে। মনটাও ভালো নেই। আজ ওর সন্তান থাকলে মাঠের অনেক কাজই সে সঁপে দিত তাদের হাতে। নয়নতারাকে সে সুখ দিতে পারেনি। দোষটা হয়তো তারই ছিল। কতবার মজিদ চাচা ওকে শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে বলেছে। কিন্তু সে কথায় কোনো কান দেয়নি। এখন সে বুঝছে। এখন বুঝে আর কোনো লাভ নেই।

মালেক সবুজ ঘাসে গা এলিয়ে দেয়। একটু দূরেই কবরস্থান। রোদ পড়ে ধূ ধূ করছে জগৎ। এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে কবরের দিকে। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। এখান থেকে কোথাও আর যাওয়া যায় না। শেষ বিচার একদিন হবে ভালো কাজের আর মন্দ কাজের।

মালেক তো খোদার কোনো প্রশ্নের-ই উত্তর দিতে পারবে না।

সে সারা জীবন ধরে চাষ-ই করে গেল। তার ভালো কাজ বলতে এই চাষ। যা মানুষের মুখে অন্ন জোগায়।

মালেকের কেমন ভয় পেয়ে যায়। সত্যি তো তাকেও তো মরতে হবে। ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। খাঁ খাঁ করছে সব।

সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কবরের দিকে। ভাঙা পচা বাঁশগুলো যেন ওর বুকে গুঁতো দিচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কোনো রা বের হচ্ছে না। সে যেন বোবা হয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে তাকে মাটির গন্ধ এসে জড়িয়ে ধরে। যেন চারপাশে মাটির প্রাচীর গড়ে উঠছে। মালেক পালাতে চাইছে।

তার নিশ্বাসে এখন মৃত্যু গন্ধ।

# ফুঁদির বাপ

সৌরভ হোসেন

"হাট হাট, আরে মেইন রাস্তার সুজা যাচ্চে ক্যানে রে, ধার দিয়ে চল, ঘুর ঘুর, হাট হাট, শালার গরুকে পাষ্ঠির বাড়ি দিয়ে আজ মেরেই ফেলব, হাট হাট কচ্চি, তবু শুনচে?"

"খুউব সাবধানে গরু খ্যাঁদায় মুসা। এর আগে দুবার ট্রাকের চাকার তলে গরু কাটা পড়েছে। সে ক্ষতিপূরণ দিতে তাকে টানা দু সপ্তাহ মাগনা গরু খেঁদিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল!"

"কী রে তোর তো দেখচি, ওই ফুলন ছুঁড়িকে দ্যাখার লেগি তর সয়ছে না!"

"কী যে গাহাও না, ছাত্তানভাই। দেখতে পাচ্চো না, আজ এমনিতেই দেরি হয় গেলচে!" মুসা দেরি হওয়ার অজুহাত দেখায়।

ছাত্তান গলা ছেড়ে গান ধরে, "আমার প্রাণভ্রমরা রে, আমার মনের পাখি রে...।"

মুসা ওদিকে কান করে না। সে বুঝতে পারে ছাত্তানভাই তাকে রসিকতা করেই এমন রসের গান ধরেছে। সেও এমন হাবভাব করে, যেন আপন খেয়ালে গরু খেঁদিয়েই যাচ্ছে। অথচ মুসার খেয়াল গরুতেও নেই, ছাত্তানের গানেও নেই! সে বুঁদ হয়ে আছে, ধাবার মেয়েটির প্রতি। তার আড়চোখের চাহনি, তার গাছের গুঁড়ির মতো নিটোল কোমর, এঁটেলমাটি রঙা শরীরের নিরমেদ ভাঁজ, তার ছো মেরে থাকা বুকের ডিহি, মুসার গাগতরে বড়শির মতো খচ খচ করে বিঁধছে।

ধাবার পাশের উঁচু ঢিবিতে গরুগুলোকে দাঁড় করায় মুসারা। জায়গাটা একটা দুবরে ঘাসের আচোট। ইতস্তত কয়েকটা বাঁশের খুঁটি পোঁতা। আকাশে তখন আধখানা ভাঙা চাঁদ। শূন্যে ঝুলে আছে। আধোচাঁদের আলোয় গরুগুলো চিকচিক করছে। সাদা শিংগুলো থেকে ঠিকরে পড়ছে রূপোলি জ্যোৎস্না। পায়ের খুড়গুলো রূপোর গয়নার মতো ঝকমক করছে! মুসার ভেতরটাও আনচান করে উঠছে! তার মন যে এতক্ষণ ধাবাতেয় পড়েছিল! সে হুটপাট করে ধাবার ভেতরে ঢুকে পড়ে।

মেহেদিপুরের এই ধাবাটা খাঁ খাঁ মাঠে অবস্থিত। রাস্তার দুপ্রান্তে লালামাটির খেতিজমি। রাঢ়ি ফসল। দূরদূরান্তে টিপটিপ করে রাঙামাটির গ্রাম। বসতভিটে।

ধাবাতে ঢুকেই আড়চোখে চারপাশ জরিপ করল

মুসা। নাহ, ওকে দেখা যাচ্ছে না! হাতে-মুখে জল দিয়ে খাবার টেবিলে পিঠ হেলান দিয়ে বসল। আবারও চারিধারে দৃষ্টির খেয়াজাল ফেলল, না, কোত্থাও দেখা যাচ্ছে না! তার মনমরা ভাব দেখে ছাত্তান খোঁচা মারে,

"কী রে তোর পাখিকে তো আজ দ্যাখা যাচ্চে না!"

"খাঁচার পাখি খাঁচায় ফিরে গেলচে গ "

পাল্টা রসিকতা করে মুসা। গা আশমোড়া দেয়। শরীরের সমস্ত ক্লান্তি যেন চেয়ারের পায়া দিয়ে নেমে যাচ্ছে। একটা লম্বা হাই তোলে। মাথাটাকে চেয়ারের ঠেকনাতে এলিয়ে দেয়। কিন্তু মনটা খুই খুই করে, ও কি সত্যি আজ আসেনি? মুসার চোখজোড়া যেই ঢুলে এসেছে, অমনি কানে বাঁধল,

"দেখিন, একটুখানি সরে বসেন তো, টেবিলডা মুছি দি।"

কথাটা কানে বাজতেই ঢুলতে থাকা চোখগুলো ফট করে খুলে গেল মুসার! মেয়েটি একটা ন্যাকড়া দিয়ে টেবিলটাকে সাফসুতরো করতে লাগল। মুসা চুরি করে তার দিকে তাকায়। ছাপড়িয়ে টেবিল মুছতে মুছতে মেয়েটির বুক থেকে কাপড়টা একবার আলগা হয়ে যায়। তার চাপা দেওয়া ঢলঢলে স্তনদুটো আচমকায় বেসামাল হয়ে পড়ে। মুসা চোখ বার করে দেখে, সিঁথির মতো বুকের বিভাজিকা! বিভাজিকার দুই পাশে উথলে পড়ছে সুনামির ঢেউ। যেন ফোঁস ফোঁস করে ডাকছে! ক্ষুধার তাড়নায় আকড়ে ধরতে চায়ছে কোন পুরুষালি শরীর, বাহুজোড়।

মুসা আড়চোখে লক্ষ্য করল, মেয়েটি তলচোখে তাকে একবার দেখে লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিল। চোখাচোখি হওয়াতে মুসাও কিছুটা লজ্জা পেল। মেয়েটা ফিরে যেতেই ছাত্তান টিটকিরি কাটল,

"আহা, একেবারে গদগদে মাল রে! যাকে বলে মহাসমুদ্র! তলা পাবি তো?"

"থও তো তুমার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। তুমার খুউব চোখ খারাপ।"

খচে উঠল মুসা।

"অত রাগছিস ক্যানে? এক্টুখানি ঠাট্টা নাহি কননু। তবে যাইই বুল, মাল কিন্তু খাসা!" কথাটা বলেই ছাত্তান চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেল।

মুসা থতমত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কতি যাছা?"

"যাই, আজ এক খ্যাপ মেরে আসি গে। মুনটা খুঁই খুঁই কচ্চে। তারপর তোর এই ছুঁড়িডা জানডাকে আরও খুঁচিয়ে দিয়ি গ্যালো। এখুন অ্যাকআধ খ্যাপ না মারা পযন্ত মনটা থির হবে না। শুনলাম, ধাবায় নাকি জালি মাল ঢুকেচে! যাই দেখি অ্যাকআধটা ধত্তে পারি কি না।"

ধাবার পেছনের দরজা দিয়ে মিচকি হাসতে হাসতে ছাত্তান ভেতরে সেঁধিয়ে গেল।

হু হু করে উত্তরে বাতাস গা হালিয়ে দিচ্ছে। ফিনফিনে কুয়াশায় ছেয়ে আছে চরাচর। দূরে তালগাছগুলো যেন মাথায় সাদা টুপি পরে আছে। কুয়াশার সাদা জাল লেপ্টে আছে পাতায় পাতায়। নয়ানজলিতে শুয়ে আছে কুয়াশার হিমেল শরীর। ভরা কার্ত্তিক। কাঁথায় মোড়া শীত সিড়সিড়িয়ে নামছে। পা গুটিয়ে বসল মুসা। প্রতিবারই খাওয়ার পর সে ধাবার বাইরের এই বেঞ্চটাতে কিছুক্ষণ জিরোয়। আরাম করে। ধকল তো কম যায় না! সেই সুল্লুকপাহাড়ের হাট থেকে গরু কিনে তামাম রাস্তা হাঁটিয়ে আনতে হয়। মহাজনের গরু কিনে দেওয়া পর্যন্তই কাজ শেষ। তারপর তিনি পারসোন্যাল গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি চলে যান। তারপর সবকিছুই মুসাদের জিম্মায়। রাখাল হিসেবে তাদেরকেই গরু হাঁটিয়ে আনতে হয়। প্রথম প্রথম মুসার পা ফুলে বালিশ হয়ে যেত! পায়ের তালুতে ফুস্কা পড়ে যেত! ব্যাথায় ক-দিন পা তুলতেই পারত না! টনটন করত। একদিন কাজে গেলে, সাতদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হত! এখন অবশ্য অভ্যাস হয়ে গেছে। হেঁটে হেঁটে পাগুলো যেন আর রক্ত-মাংসের পা নাই, শক্ত কাঠের চলাহ! রক্ত-মাংসের শরীরটাও যেন কাটা গাছের গুঁড়ি!

"অ্যাকা অ্যাকা বসি কী ভাবচেন?"

আচমকা কথাটায় ঘোর ভাঙে মুসার। দেখে, ফুলন তার ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মুসা কাচুমাচু করে বলে,

"কই ? না তো, কিছুই ভাবচি না।"

"ভাবচি না বুললেই হবে, কিচু যদি নাইই ভাবচেন, তো অতো আনমনা ক্যানে? বন্ধুর লেগি অপেক্ষা কচ্চেন?"

"হ্যাঁ।"

আমতা আমতা করে মুসা।

"আপনার ইচ্ছে করে না? মুনে সাধ জাগে না?"

প্রশ্নটি করে ফুলন ফিক্ করে হাসে।

"সাধ তো অনেক কিছুই জাগে, সব সাধ কি আর মিটে?"

"অ কী কথা কহান, ব্যাটা ছেলির আবার সাধ মিটে না? আপনার কী সাধ মিটিনি শুনি?"

ফুলন প্রশ্নটা করেই বেঞ্চে পা ঝুলিয়ে বসে।

"তুমার কি ডিউটি শেষ? আর কাজকম্ম নাই?"

জানতে চায় মুসা।

"হ্যাঁ, আজকির মুতন শেষ। ইবার বাড়ি ফিরব।"

"তারপর হুট করে বলে "আমাকে আপনার ভাল লাগে?" মেয়েটির কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ে মুসা। ভেতরটা ধক করে ওঠে। ঠোঁটের ফাঁকে চিলতে হাসি হেসে বলে,

"খুউব।"

"ড্যামনামু দেখে গা জ্বলে যায়!" ঠোঁট বাকায় ফুলন।

"তুমার বাড়িতে কে কে আচে?"

"তিনড্যা প্যাট, আমি, আমার বুড়হ্যা মা আর আমার পুনে চার বচ্ছরের অ্যাকটা মেয়ি।"

"তুমার মেয়ি!"

অবাক হয় মুসা।

"হ্যা, আমার মেয়ি।"

"তা মেয়ির বাপ কী করে?"

"উ কথা আর জিগায়েন না। অ পাপের বুঝা বইচি। সে ল্যাড়খেকে...।"

কথাটা বলতে বলতেই ফুঁপিয়ে ওঠে ফুলন। মুসা বুঝতে পারে, এ ব্যাপারটাই কিছু একটা ক্যাচাল আছে। সে আর ভেতরে ঢোকে না। সে প্রসঙ্গ পাল্টায়,

"তুমার এই ধাবাতে রাতবিরেতে কাজ করতে ভাল লাগে?"

"তো কী কইরি খাব? যা তা করি খাতে তো হবে?"

"কেউ যদি তুমাকে ইখান থেকি লিয়ি যায়, তুমি যাবা?"

"মানে! আমি ঠিক বুঝলাম না, আপনি কী বুলচেন!"

ফুলন মুসার কথায় তাল পায়না। সে মুসার ইঙ্গিত বুঝতে পারে না। আচমকা কেমন যেন ফোঁস করে ওঠে। মুসা তার টের পেয়ে ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে বলে ওঠে, "মানে, মানে আমি বুলছিলাম আর কি যদি কেহু অন্য জাগায় আরও ভালো কাজের হদিস দ্যায়, তাহলে তুমি যাবা কি না আর কি।"

আমতা আমতা করে মুসা। ফুলন কোন উত্তর না দিয়ে বাড়ির তাড়া দেখিয়ে উঠে পড়ে। হনহন করে মেইন রাস্তার দিকে হেঁটে যায়। মুসা বাঁকা চোখে দেখে, ফুলনের নিরমেদ শরীর, ধামার মতো পাছা, টানটান বুক। কিছু দূর যেতেই শরীরটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে। কুয়াশার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। মুসা ভাবে, ফুলন এভাবে ভর রাতে একা একা হেঁটে মাঠ পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে? আমি কি যাব? না থাক, যাব না, তখন যদি ও নাকচ করে। যদি বলে, আমি ওর কে যে ওকে এগিয়ে দিয়ে আসব?

ভেতরটা আনচান করে ওঠে। বেঞ্চে পাছা ঠেকে না। অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া শরীরটা তাকে বড্ড টানে। আর থির থাকতে পারে না। সে গডগড করে হাঁটা ধরে। হাঁটতে হাঁটতে দৌড় দেয়। কুয়াশার ঝাপসাতে কোনরকমে বোঝা যাচ্ছে তার লম্বা গড়নের থিনথিনে শরীর। হিমেল হাওয়াতে উড়ছে পরনের আকাশিরঙা শাড়ি। যেন নিঃশব্দ রাতে নিঝুম মাঠ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কোন রাতচরাপরি!

"তোমার ভয় করে না?"

আওয়াজটা শুনেই থক করে দাঁড়িয়ে যায় ফুলন। পিছন ফিরে,

"আপনি!"

"হ্যাঁ, চলিই আনু, ভাবনু অ্যাকা অ্যাকা মেয়ি মানুষ এই ভর রাতে ফাঁকা মাঠ দিয়ি যাতে পারবা কি না, তাই...।"

"ও, বুঝনু।" ঘাড় নেড়ে ফুলন হাঁটতে হাঁটতে আবারও বলতে থাকে,

"আমি তো রোজ অ্যাকা অ্যাকাই যাই, আপনি অ্যাকদিন আমার সাতে এইসি কী আর হবে? অ্যা তো আমার অ্যাকারই জীবন? অ্যাই করিই তিরিশডা বচ্ছর কেটি গ্যালো!"

কথা ভারি হয়ে আসে ফুলনের। সে আচমকাই বলে ওঠে, "আমাকে আগলে কী লাভ, আমার এই গা-গতরের সব জায়গায় পাপ লেগি আচে, পর-পুরুষের ছোঁয়া লেগি আচে। অ্যাতটুকুনও পবিত্র নাই। সব মাছ ধরি লিয়চে। আবার কে ছিপ ফেলবে?"

ফুলনের কথা শুনে হকচকিয়ে যায় মুসা।

"কী হল, হঠাত অ্যামুন চুপ হয়ী গ্যালেন ক্যানে?"

"কই, না তো?" ঘোর ভাঙে মুসার।

ফুলন ফিসফিস করে বলতে থাকে, "আপনাদের মুতন মুসাফির দেখি আমার ভয় লাগে, আপনি ফিরি যান, আমি অ্যাকা ঠিক চলি যাব।"

"কীসের ভয়, ফুলন? আমি তো বাঘ-ভাল্লুক নই, যে খেয়ি ফেলব?"

"কে বুলল, মানুষ বাঘ-ভাল্লুক লয়? মানুষ বাঘ-ভাল্লুকের থেকিও খারাপ ! ওই যে ধাবার ম্যানেজারবাবু, বুলেন দেখি, উ মানুষ না জন্তু? ওই যে আপনার বন্ধু, যিনি ভিতরে ঢুকি গ্যালেন, উনিও কি মানুষ ? উনি তো জুকের মুতন অ্যাকটা মেয়ি মানুষের সরিলকে চুষি চুষি খাবেন! মানুষ চিনতে আমার বাকি নাই, বুঝলেন? ছ-বচ্ছর গতর খাটান্যে লাইনে ছিনু। সব ব্যাটাকে চেখি দ্যাখা আচে।"

ফুলনের কথাতে মুসার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। একটু হলেও কথাগুলো তাকে বিঁধে। তার নিজের বেশ্যালয়ে যাওয়া কথাগুলো মনে পড়ে যায়। সে নিজে নিজের কাছে অপরাধী হয়ে ওঠে।

"আপনি ফিরি যান, আপনার বউ শুনলি পড়ে ঝামেলা পাকাবে।"

বউ! 'বউ' কথাটা শুনেই মুসার পিলে কট করে ওঠে! কুঁকিয়ে ওঠে হৃদপিণ্ডটা! তারপর ফোঁস করে ওঠে ভেতরটা গেয়ে ওঠে, উ মাগি বউ না, ঢেমনি, তানাহলে

অমুন ঢেমনিপনা কাজ কততে পারে? জুয়ান মরদ থাকতে পরপুরুষের সাতে লটরপটর! উ মাগি চলি গেলচে, ভালো হয়চে। মানসম্মান বাঁচা গেলচে।

"বউ থাকলে পরে তো ঝামেলা পাকাবে?" কষ্ট করে ভেতরের হাড় ফাঁটা হাসি ঠোঁটের ফাঁকে রেখে বলল মুসা।

"ক্যানে! আপনি অ্যাখুনও বিহ্যা করেননি!" অবাক হয় ফুলন!

"আর বিহ্যা, বিহ্যা অ্যাকটা করিচিনু, উ বিহ্যা টিকিনি, উ দুশ্চরিত্রা মেয়ি, ঢেমনি, অ্যাক ঢ্যামনার সাতে লটঘট কততে কততে পালি গেলচে! যাগগে, উ কথা ছাড়ো, তুমার কি খুউব জাড় লাগচে?"

"ই জারে আমার কিচ্ছুটি কততে পারবে না। আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, সে আগুন তো কখনো লিভার নাই । অভাবের আগুন, খিদের আগুন, ওই অভাবেই পুড়ি পুড়ি কঙ্কাল হয়ী গেনু। ই গায়ে কি আর গোস্ত আচে? হাড় গো হাড়, ই হাড়ে কি আর জাড় লাগে?"

লালমাটির একটা উঁচু ঢিবিতে উঠল তারা। ঢিবিটায় ছ্যাড়ড়া হয়ে পড়ছে চাঁদের আলো। দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন একটা জ্যোৎস্নার পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে মহুয়া আর পলাশ গাছের সারি। লালমাটি আঁকড়ে আছে চাপাটি আর দূর্বা ঘাসের ঝোপ। ঘাসের ডগায় মুক্তোর মতো জমে আছে শিশিরবিন্দু। ঢিবির পাড় ঘেঁসে সাপের মতো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে হেঁটোপথ। শিশিরে পিচ্ছিল এই সর্পিল পথ বেয়ে নামতে গিয়ে ফুলনের পা যেই সড়কে গেল, অমনি খামচে ধরে নিল মুসা। কিন্তু কেউই নিজের ভার সামলাতে পারল না। দুজনেই পা হড়কে ভেজা ঘাসের ওপর ধপাস করে পড়ল! পুরুষের ছোঁয়া পেয়ে সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল ফুলনের। একটা অদ্ভুত কাঁপুনি। মাতলামি শিহরণ। চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠল তার। বাসি শরীর হঠাত উত্তাপের আঁচ পেয়ে টগবগ করে ফুটতে লাগল! ভেতরের ঢেউ আছড়ে পড়ল মুসার গায়ে। মুসা জাপ্টে ধরল ফুলনকে। একটু একটু করে শরীর শরীরে মিশে যেতে লাগল। রাঙ্গামাটির এই আলপথ ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে এক মোহময়ি বিছানা। স্বর্গীয় খাট। ফুলন যেন এক জান্নাতি হুর! রাখাল মুসা তার চিতোল বুকে জড়িয়ে নিল ফুলনের সমস্ত উচ্ছ্বাস। অনেকদিন পর শরীরের স্বাদ নিল ফুলন। তার জমে থাকা খিদের আশ মিটিয়ে নিল। রাখাল মুসা গরু হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিজেও কবে কবে আস্ত বলদ হয়ে উঠেছে! তার শরীরের দম যেন ফুরোতেই চায় না! ফুলনের উর্বর খেতিতে ভালই চাষ করল সে।

দুটো রক্ত-মাংসের শরীর রাঙামাটির বিছানায় কিছুক্ষণ নেতিয়ে পড়ে থাকল। চাঁদের আলোয় রূপোলি পাহাড়ের মতো ঝকমক করছে ফুলনের নগ্ন বুক! শিরিষ পাতার মতো বিছিয়ে আছে দুটো আদুর গা। হু হু করে বয়ছে উত্তরে বাতাস। মুড়ো পলাশ গাছ থেকে খসে পড়ছে শুকনো পাতা। যেন প্রকৃতি পত্রের অঞ্জলি ছড়িয়ে দিচ্ছে মাটি-রাঙা প্রেমের শরীরে। ধড়মড়িয়ে ওঠে পড়ল ফুলন। তার মুখ আর রাঢ়ি মাটি যেন এক হয়ে উঠেছে! পরনের জুবুথুবু শাড়িটা গুটিয়ে গটগট করে হাঁটা ধরল ফুলন। পিছন থেকে মিহি করে ডাকল মুসা,

"ফুলন।"

## দুই

এক খুপরি লালমাটির ঘর। খড়ের ছাউনি। ছোট্ট বারান্দা। মাঠ ঘেঁষা বাড়ি। দেওয়ালে লেপ্টে আছে ঘুঁটো। ঘুমন্ত উঠোন ডিঙিয়ে দুয়ারে উঠল ফুলন। গলা আলগা করে ডাকল,

"মা, মা, দজ্জা খুলো। দ্যাখো কে এসচে।"

কচ করে দরজাটা খুলল ফুলনের মা। দরজার ফাঁকে ভাঁজ পড়া থুথুরে মুখটা রেখে বুড়ি জিজ্ঞেস করল,

"কে ডা রে ?"

"ফুঁদির বাপ গো, ফুঁদির বাপ।"

বৃদ্ধা দরজাটা হাট করে খুলে দেখল, একটা গাট্টাগোট্টা ব্যাটাছেলে মানুষ ছঞ্চেয় দাঁড়িয়ে আছে! জিজ্ঞেস করল,

"অ্যাতদিন কুণ্ঠে ছিলা ?"

# আধো ভোর

দীননাথ মণ্ডল

- বাপজানের কতা তুর মুনে পড়ে?

- না আম্মা।

- মানুসডা কি ভালুই ছিনু। উ আইজ ব্যাঁচে থাকলি, তুকে অতো খুয়ার করতি হুতোক না।

- মা আব্বুকে কারা ম্যাইরাছে ?

- অ ও জানুম না, বাপ!

দিনের খাটুনিই ঘুম আসে রহিমের চোখে। কথা বলতে বলতে দুখুর চোখে পানি গড়িয়ে পড়ে। শাড়ির খোটটা দিয়ে চোখের নুই মুছে। ছেলের পিঠে হাত বুলাতে থাকে। ঘুম নেমে আসে তারও চোখে। অন্ধকারের ঘুমপুরীতে একসময় দু'জনেই ডুব দেয়।

এক দুঃস্বপ্ন ভেসে আসে আঁধারের বুক চিরে দুখুর চোখে। চা দিতে যায় রহিম, বড়ো রাস্তা পাড় হয়ে। একটা ট্যাক্টর সজোরে ধাক্কা মারে। চীৎকার করে ওঠে দুখু। ঘুম ভেঙে যায় রহিমের। সে বলে-

- কি হইচে মা, কাঁদ্ ক্যান?

- অ কিচু না বাপ, সপন দ্যাখছি।

- কি সপন মা?

- বুকে আয় রহিম। বুকে আয় -!

ছেলেকে জড়িয়ে ধরে, ঘামে ভেজা সারা শরীরে একটা স্বস্তির বন্যা বয়ে যায়। আলতো ভাবে ছেলের চুলে হাত বুলাতে থাকে। বুকের ধ্বস্ ধ্বস্ শব্দ ক্রমশ মিশে যায় আঁধারের মধ্যে।

কক্ কক্ কক্-ক-ক-র — কক্। মোরগটা ডেকে ওঠে খুল্লুর ভেতর থেকে। ঘুম ভেঙে যায় দুখুর। দেখে চারিদিক ফর্সা হয়ে আসছে। সে বিছানা ছেড়ে ওঠে পড়ে তাড়াতাড়ি। দেরি হয়ে গেল নামাজে। বদনার পানিতে হাত মুখ খুয়ে রুজু করে ফজরের নামাজে বসে। আল্লার কাছে দোয়া চায় আজকের স্বপ্ন যেন ছ্যাঁচায় না হয় তার জীবনে। ছেলের মুখে দিকে চায়। সকালের রোদটা খোলা জানলা দিয়ে এসে পড়েছে মেঝেয়। রোদের ছটায় রহিমের মুখ চকচক করছে। চাঁদের জোছনার আলোও এভাবেই পড়ে মেঝেতে। কালবৈশাখী ঝড়ে যখন খড়ের চালের খড় উঠে গিয়ে মাঝে মাঝে গর্ত হয়ে যায়। চাঁদ সূর্য সবার কাছেই সমান। গরিব ধনী কাউকেই তাদের আলো থেকে বঞ্চিত করে না। আল্লাতালা যে মহান! দীনদুনিয়ার মালিক। চাঁদ সূর্যকে সৃষ্টি করেছে জগতের সেবা করার জন্য। ছেলের কপালে হাত বুলিয়ে দুখু ঘরের বাইরে আসে।

সকালের বাসিকাজ তাড়াতাড়ি সেরে মুদির দোকানে যায় সে। বাটিতে করে একচিন গুড় আনে। রহিম ঘুম থেকে ওঠলে তাকে মিষ্টি মুখ করায়। রাতের স্বপ্ন সারাদিন ঘোরাফেরা করে মাথায়। মনে পড়লে আঁতকে ওঠে। ছেলেকে কাজে পাঠিয়ে তর সয় না, মনে শান্তি নাই।

আজকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে ঠিক করেছে। কাজের চাপে নামাজ পড়া কোনদিনই তার ঠিক মতো হয়ে ওঠে না।

রহিম তার একমাত্র বুকের ধন। বাপহারা ছেলেকে মানুষ করার জন্য কিনা করেছে এ জীবনে। গায়ে গতরে খেটেছে রাত দিন। মাথার ঘাম ফেলেছে পায়ে। দু'টি পেটের রুজির জন্য কত কী করেছে সে। গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিয়েছে- পতাকা হাতে মিছিলের আগে হেঁটেছে। আউরিছে নেতাদের শিখানো বুলি। তারা বলেছিল, লাল কার্ড দিবে। বিনা পয়সায় কন্ঠল থেকে চাল-গমের ব্যবস্থা হবে। কতদিন ট্রেনে করে কলকাতাও গেছে মিছিল-মিটিং এ। এ গ্রামের বিড়ি বাঁধা মেয়েদের নিয়ে সে মিটিং এ যেত। এই গ্রুপের দায়িত্ব দিয়েছিল নেতারা তাকেই। অনেকেই তার চারিপাশে এসে ছুঁকছুঁক করত। কাউকে পাত্তা দেয়নি। ছেলের পানে তাকিয়ে। ছোটবেলায় নানির কাছে শুনেছে পরপুরুষের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে নাই। গুনা হবে। যেতে হবে দোজগে। সেখানে গরম শিকের ছ্যাঁকা- আরো কত কী শাস্তি ! মেয়েদের গুনা আল্লা মাফ করে না। হিজাব বোরখা মেয়েদের ফরয।

ভোট ফুরালে সে নেতাদের বাড়িও যায়, বিনা পয়সার চালের কথা বলতে। তারা বলে, - ভালো কইরে সংগটন কর্, ফির্ ভোটের পর তুকে ঘরেরও ব্যবস্তা কইরা দিমু।

এভাবেই ভোটের পর ভোট পার হয়। কিছুই পাইনি। রাগে অভিমানে সে মিটিং মিছিলে যাওয়া ছেড়ে দেয়। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চোখের নুই ঝরে।

মনে পরে মরদের কথা। তেরো বছর বয়সে তার লিকি হয়। তেনো ব্যাপারীর ছেলের সঙ্গে। শ্বশুরের গণ্ডা দুয়েক ছেলে। জোতজমা কিছুই নাই- ভিটাটুকু ছাড়া। বড়ো গুষ্টি। বিকেল গড়িয়ে আসে। পথের পানে ঘন ঘন চায়। মনের ছটপটানি দূর হবে ছেলে বাড়ি আসলে। রাতের দুঃস্বপ্ন যেন তার পিছু-ই ছাড়ছে না।

রহিম বাড়ি ফিরলে জড়িয়ে ধরে বুকে। বাতাস করে হাত পাখা দিয়ে। আখা থেকে গরম ভাত নামাই। আলু সিদ্ধ পিঁয়াজ সানা করে নিজের হাতে খাওয়ায়। মাটির মেঝেতে শুতে যায় তালাই পেতে। ছেলের চোখে ঘুম না আসা পর্যন্ত অনবরত বাতাস করে। পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

দেখতে দেখতেই পাঁচটি বছর গড়ায়। রহিমের চোখ মুখ একটু ফুটেছে। ঠিক করে ব্যাংগোলে কাজে যাবে। গায়ের ফুলু মিস্ত্রি জুগালের ঠিকাদারি করে। গায়ের অনেকে যায়। টাকা কামাই। বাড়ি এসে মাটির দেওয়াল তুলে টালির ছাউনি দিয়ে ঘর বানাই। রহিমের ইচ্ছা, পাটকাঠির বেড়ার ঘর ভেঙে ওই রকম ঘর করবে সেও। বিস্টির পানি আর ঘরে পড়বে না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি সেরে বিছানায় একটু স্বস্তিতে ঘুমাবে। বৃষ্টির পানি চালের ফুটো দিয়ে আর মেঝেতে পড়বে না।

দুখুর মন সয় না, ছেলেকে কাজে পাঠিয়ে। মাস দুয়েকের পর, হঠাৎ করে খবর আসে ব্যাংগোল থেকে। ভাড়া কেটে পড়ে গেছে অনেকে। রহিমও আছে। সবাই হাসপাতালে ভর্তি। সে ছেলের জন্য কাঁদে। দোয়া চায় আল্লার কাছে। ছেলের সুস্থ্যতা কামনা করে। কসম করে মসজিদে সিন্নি দিবে। ঘুম আসে না রাতে ঠিক মতো। ফুপরে ফুপরে কাঁদে।

রহিমের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। সপ্তাহ খানেক পর সে মারা যায়। লাশ আনা হয় বাড়িতে। দুখু অজ্ঞান হয়ে যায় ছেলের মরা মুখ দেখে। মুখের বাক্ হারায়। এভাবে মাস খানেক কাটার পর একটু সুস্থ্য হয়। তাকে দেখার মতো কেউ নাই। এদ্দিন ছালেহার-ই দেখেছে।

ছালেহার বেওয়ার ছেলে বউ থাকলেও কেউ খেতে দেয় না। একটা চালা ঘরে আলাদা ভাবে থাকে। দুখুর বাড়ি লাগোয়া। সকালের লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে। ভাবতা-বেলডাঙার দিকে নামে। সারাদিন ভিক্ষা করে সাঁজের ট্রেনে ফিরে। এভাবেই তার সংসার চলে।

মরদ হারা দুখু একটু মানসিক শক্তি পায় ছেলেকে দেখেই। বাঁচার তাগিদ অনুভব করেছিল। ছেলের মৃত্যু সব কেড়ে নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ অসহায়। শরীর ভেঙে পড়ে দিন দিন। ওঠতে বসতে ঝিনঝিন্ করে হাত পা। চোখে লাগে আঁধার। মুখের দাঁতগুলো সার হয়ে পড়ে। অকালে জ্বরা ধরে। মাঝে মধ্যে বাঁশতলার ভেতর যায়। ছেলের কবরের পাশে বসে থাকে। আর কাঁদে।

একদিন দুখুও ছালেহারদের পথ অনুসরণ করে। লালগোলা স্টেশন গেলে অনেকেই তাদের মতো। একসঙ্গে দলবেঁধে যায়, আবার দলবেঁধেই ফিরে। সাত পাঁচ কথা হয়। দুখু কথা বলে কম। স্বামী-পুত্র হারা শোক সে ভুলতে পারে না। মাঝে মাঝে শরীরে ফিট্ ধরে। বিছিন ছেড়ে ওঠতে পারে না দিন কয়েক।

দুখুর জানে জুত নাই। মনটাও ভালো নাই। স্বামীর কথা মনে পড়ে। এই সময়টা এলেই বেশি বেশি মনে আসে। সেবার ভোটের সময় গা জুড়ে ঝামেলা। ছেলের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। স্বামী ভিন গায়ে মুনিস খাটতে গেছিল। ফেরার সময় মাঠের মধ্যে কারা যেন খুন করে। সেদিনে কথাগুলো ভুলতে পারে না দুখু। ভাল্ লাগে না তার, ভিখ্ করতে যেতে। আর দু'দিন পরে ভোট। সবাই ভোট নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ভিখ্ দিবে না। খাবে কী!

রোজকার মতো ট্রেন ধরে, ছালেহারদের সঙ্গে বেলডাঙ্গায় যায়। মঙ্গলবার, হাটবার। ভিখ্ করবে হাটে। থানার পাশ দিয়ে একসঙ্গে তারা দল বেধে এগিয়ে যায়।

থানার ভেতরে একগাদা ভিড়। দেখতে যায় সবাই, কী হয়েছে। ভ্যানের উপর ত্রিপল জড়ানো দু'টি লাশ। মাথা দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। লোকে বলা-কওয়া করছে কাঁপাসডাঙ্গায় খুন হয়েছে। ভোট নিয়ে গণ্ডগোল।

দুখুর মাথা ঘুরে ওঠে। আঁধার লাগে চারিদিক। রক্ত দেখে এদানিং তার এরকম হয়। ছালেহারের কাঁধে হাত রাখে দুখু। আস্তে আস্তে বলে, - অই, মুই ভিখ্ করতি যামু না আইজ।

- কি হইচে গা?

- জান্ডা ক্যামুন্ করচি। মাথাডা ঘুরচি, গা গুল্লি উঠচি।

- অ অক্তো দ্যাইখি অমুন্ডা হোচ্চি।

- তু যা। আইজ মুই যামু না।

- ইস্তিসানে গিয়া বসগা। ভিন্ ব্যালায় একসাতে বাড়ি যামু।

সবাই হাটে যায়। দুখু ইস্টিশানের কড়াই গাছের নীচে ছায়াতে বসে। মুখ দিয়ে ঘন ঘন থুতু ওঠে। গায়ে বমি বমি ভাব। কলের কাছে যায়। মাথায় জল দেয়। আবার এসে বসে। মাথার উপর কড়াই গাছে ডালে লটপট লটপট করেছে কাকগুলো। কা কা চিৎকার। ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিকে। যেন মাথার পোকা বের করে দেবার উপক্রম। খোদার সংসারে পেটের দায়েই সবাই ছুটে বেড়াই। পেট বড় বালাই। ফাঁকা স্টেশন চত্বর মুহূর্তের মধ্যে ভরে যায়। ট্রেন চলে গেলে আবার যেমনকার তেমন। সবাই-ই ছুটে পেটের টানে। পেট আল্লার এক আজব সৃষ্টি। নানিকে আজ বড় মনে পড়ে তার। ছেলেবেলায় নানির বাড়িতে বড় হয়েছে। সাঁঝবেলায় দুয়ুরে বসে নানি কোরান শরিফ পড়ত। নানির পাশে বসে সে একমনে শুনত। হাদিসের নানা গল্প বলত নানি। নানি ভোট দিতে গেলে দুখুও তার সঙ্গ নিত। নানির হাত ধরে যেত। ভোট এলেই দুখুর খুব আনন্দ লাগত। পাড়ার মেয়েরা সবাই একসঙ্গে দল বেধে ভোট দিতে যেত। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেত তাদের সঙ্গে। রাস্তার দু'ধারে বসত পাঁপড় ঘুগনি বেলুনের দোকান। নানি বলত 'ভোট আমাদেকো দ্যাশে পরব গো পরব'। আর এখন ভোটের নাম শুনলেই দুখুর হাড় হিম হয়ে যায়। বুক ধ্বস্ ধ্বস্ করে। স্বজন হারানো কান্না বুকে বেজে উঠে। ভোট এলেই সারা গ্রাম কেমন যেন থমথমে লাগে। চেনা মানুষগুলো আড়চোখে দেখে। পাড়ায় পাড়ায় গণ্ডগোল, খুনোখুনি লেগে থাকে। ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে প'ড়ে।

ছালেহারের ভালো লাগে না, দুখুকে ছেড়ে। তাকে মেয়ের মতো ভালোবাসে সে। চোখের ছামুতে ছালেহার হারাতে দেখেছে তার একমাত্র মেয়েকে। চৌদ্দ সাল পাড় করে পনেরোই পা দেয়। গায়ে গতরে বেড়ে ওঠায় কাল মেয়ের। ছাগল চড়াতে গেছিল পদ্মার ধারে। বেপাত্তা হয়ে যায়। মেম্বার, প্রধান, পুলিশকে জানিয়ে কোন কাম হয়নি। হন্যি হয়ে ছুটে বেড়েয়েছিল এখানে ওখানে। সেই থেকে মেয়ের কথা মনে পড়লে ছুটে আসে দুখুর কাছে।

- ওঠ্ দুখু, তেন্ ধরতি হবে। ছালেহারের ডাকে দুখুর ঘুম ভাঙে।

- কুন্ তেন্?

- আগির তেনতা।

দুখুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে সে। গা হাত পা গরম। ছালেহার ছাদের কবিরাজের বাড়ি যায় পানি পড়া আনতে। কবিরাজ বলে, -লাস দ্যাখে হাওয়া ভাব্ হইচে। কড়ি আড়ি তো, জিনে একতু ভর করেচি। পানি পড়া খায়ি দিলি, মুখ্ চোকে ছিটি দিলি ছব্ থিক্ হইয়ে যাইবি।

রাতে একচিন চাল ফুটায়। আলু সানা ভাত দুখুকে খাওয়ায়। নিজে খায় ছালেহার এবং দুখুকে খাওয়ায়। দুখু দু'এক গ্রাস খায়। তারপর দু'জনেই ঘুমিয়ে প'ড়ে। মঙ্গলবারে তাকে একটু বেশি ছুটাছুটি করতে হয়। সপ্তার এদিনেই বেশি ভিখ্ পাওয়া যায়।

ভোরবেলায় মোরগ ডাকে ছালেহারের ঘুম ভাঙে। দেখে দুখুর মুখ দিয়ে ফ্যানা বেরছে। তাড়াতাড়ি সে ছাদের কবিরাজের কাছে ছুটে যায়। কবিরাজ এসে দেখে, দুখুর চোখ মুখ স্থির, হাত পা আড়কাঠ। সাড়াশব্দ কিছুই নাই। ছালেহার কবিরাজের পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এ অঞ্চলে ছাদের কবিরাজকে লোকে পীর বলে মানে। সে -ই সময় অসময়ে রাত-বিরেতে ভরসা। যখন ডাকে তখনই পায় তাকে। কবিরাজ ছালেহারকে এক গ্লাস পানি আনতে বলে। কবিরাজ দোয়া-দরুদ পড়ে পানি ছিটিয়ে দেয় দুখুর চোখেমুখে। কবিরাজ বাড়ি চলে যায়। চারিদিক ফর্সা হয়ে আসে। বাঁশ বাগানে উপর থেকে সূর্যের আলোর ছটা দুখুর মুখে এসে পড়ছে। সূর্যের আলো বাড়তে থাকলেও দুখুর জীবন আলো নিস্তেজ হয়ে যায়। দুবার ঝাঁকুনি দিয়েই তার জীবন সমাপ্ত হয় বিহান বেলার ঘড়িতে। ছালেহার ঢুকরে কেঁদে ওঠে।

বেলা হলেই মাটি দেওয়ার জন্য পাড়ার লোকজন আসে। ছাদের কবিরাজও আসে। খাটে লাস তোলা হয়। পশ্চিম দিকের কাঁচা রাস্তা ধরে লোকেরা এগিয়ে চলে। কবরের দিকে। ছালেহারও তাদের পিছন পিছন রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে যায়। মেয়েদের কবরস্থানে যাওয়া ফরয নয় এই ভেবে সে আর এগোতে পারে না। রাস্তার মাঝেই সে বসে পড়ে ধুলোতে। পশ্চিম পানে মুখ ক'রে, দু'হাত তুলে আকাশের দিকে। আল্লার কাছে দোয়া চায়,

- হে খুদাতালা, দুখু মরদের সুখ পাইল না, ছ্যাইলার সুখ পাইল না। তুমি ওয়ার গুনা মাফ্ কইরো।

তার দু'চোখ বেয়ে টসটস্ করে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে শুকনো মাটির উপর...

# ঢপ কীর্তন ও রূপচাঁদ অধিকারীর জীবনের কিংবদন্তি

রূপক কুমার চট্টোপাধ্যায়

চৈত্র মাসের দুপুরে হেঁটে চলেছেন এক যুবক গায়ক, দেহে নামাবলী কপালে তিলক। মাথা ভর্তি কালো চুল। তিনি চলেছেন দূরের গ্রামে সন্ধ্যার আসরে 'ঢপ কীর্তন' গান গাইবেন। গায়কের বাড়ি বেলডাঙ্গার দক্ষিণপাড়া। পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। পিতৃদেবের বাড়ি ছিল সালারের (ভরতপুর) তালিবপুর গ্রামে। নিঃসন্তান মাতুলালয়ে প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রাধাকৃষ্ণের পূজা ও শিষ্যদের দেখার দায়িত্ব পান। তাঁর দুই সন্তান, বড়টির নাম রূপচাঁদ এবং ছোটটির নাম স্বরূপচাঁদ।

রূপচাঁদের ছিল ভুবনমোহিনী কণ্ঠ। তাঁর গান শুরু হলে হাটে বাজারে কোলাহল থেমে যেত, কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যেত। মাঝি নৌকা ছেড়ে গানের আসরে চলে আসত। বহুদূরের রাধাকৃষ্ণের নাম পিপাসু নরনারী ছুটে আসত। ঢপ কীর্তন গানের প্রবর্তন করার জন্য, রাধাকৃষ্ণের পূজার জন্য গুরু মন্ত্র দেওয়ার জন্য পদবী হয়ে গেল অধিকারী। রূপচাঁদ এর জন্ম ১৭২০-১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে এবং তিনি দেহত্যাগ করেন ১৭৯০-১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে। শিমুলিয়াতে গুরুর কাছে গানের তালিম নেন। সংগীত গুরু তাঁকে একটা ডুগরী ও একতারা উপহার দেন। এই যন্ত্রের সুরে তিনি গান ধরতেন। দূরের গ্রামের বধূ কাজ ফেলে ছুটে আসতেন মনের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য। যে গৃহে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ থাকত সেখানে তাঁর সংসার। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ ছিল তাঁর আহার। তিনি আত্মবৎ সেবা চালু করেন। যার অর্থ হল খাদ্য পরিধেয় বিষয়ে ভক্ত যে ভাবে জীবন যাপন করবেন সেই ভাবে পূজার ভোগ নিবেদিত হবে। ঋতু অনুযায়ী ভোগ, পোশাক প্রভৃতি পরিবর্তন হত। সকলে বৈষ্ণব, সুতরাং নিরামিষভোজী। গৃহে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ ছিল আহার। বাড়িতে সংস্কৃতে কথা বলতেন এবং টোলে ছাত্র পড়াতেন। আলাদা করে কোন মন্দির বা দেবগৃহ ছিল না, গৃহীর সংসারের আপনজন ছিলেন রাধাকৃষ্ণ।

প্রচণ্ড রোদের তাপ, আবার জল পিপাসা পেয়েছে, তাই গায়ক সুরকার ঢপ কীর্তন গানের প্রবর্তক রূপচাঁদ অধিকারী একটা পুকুরের পাশে বট গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসলেন। পুকুরের স্নিগ্ধ সুশীতল জল পান করে পিপাসা দূর করলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর বিচলিত হয়ে উঠল। মন স্থির থাকতে চাইল না। মনে হল যেন দূরের কোন স্থান থেকে নারীর কান্না তিনি শুনতে পাচ্ছেন। অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করবার পর বুঝতে পারলেন দূরের পর্ণ কুটির থেকে ওই কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। তাঁর মন বিচলিত হল। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না।

নারীর মনঃকষ্ট তিনি অনুধাবন করলেন। ডুগরী হাতে নিয়ে সুরের মূর্ছনায় গান ধরলেন।

কি হেরিলাম নৃপ মূলে ধন্দ; এক বিনদ কানা বিবিধ ধন
নিলা লাবণ্যে ঝরয়ে মক বন্ধ; ভবজ অনুজ রথ তা ওঠে
বিনতা সূত কৌরে কুমন্ধু বন্ধু সাজে। হরি অরি সন্নিধানে,
অলিরথ পুরে বাণে রমণীর মানব মন বাঁধে খগেন্দ্র
(সংগ্রাহক - বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি)

পুকুরে জল টলমল করে ওঠে। প্রখর রোদের মধ্যেও গাছে পাখি গান করে। পুকুরের পাড়ের পদ্ম পাতায় জলে সূর্যের আলোয় মনে হয় যেন শ্বেতপদ্ম মাঝে সাদা সাদা মুক্ত ঝরে পড়ছে শ্রীকৃষ্ণের চরণে। রূপ ঠাকুরের গলার গানে প্রকৃতি সাড়া দেয়, আর গৃহাভ্যন্তরে এক ক্রন্দনরতা নারী কি ঠিক থাকতে পারে! সে চোখের জল মুছে গায়কের সম্মুখে হাত জোড় করে দাঁড়ায়।

গায়ক গান শেষ করে যুবতী মেয়েকে প্রশ্ন করে- কে তুমি মা! কেন কাঁদছিলে? কারণ কী?

যুবতী মেয়ে উত্তর দেয়; তার নাম 'মুক্তালতা'। সে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঐ দূরের কুঠিরে থাকে। এক যুবক তাকে ভালোবাসে, বিয়ে করতে চাই! সে কিন্তু ডাকাত, চুরি করা, পরের দ্রব্য কেড়ে নেওয়া, হত্যা করা তার কাজ। তাই সে ঐ যুবককে বিয়ে করতে চায় না।

গায়ক বলে তা এই কথা, তুমি তোমার মনের মানুষকে তোমার মনের কথা খুলে বলো। সে তোমাকে ভালোবাসে; তোমার কথা নিশ্চয় রাখবে। ভালোবাসার মানুষকে সে ফিরিয়ে দেবে না। তোমার ভালোবাসা, সে তো জীব আত্মাকে পরম আত্মার কাছে নিবেদন।

যুবতী বলে, আপনার অপূর্ব কণ্ঠস্বর শুনে ঠিক থাকতে পারলাম না; আপনার কাছে চলে এলাম। আমাকে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দেন; আমাকে আপনার শিষ্যারূপে বরণ করে নেন। গায়ক যুবতীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, মা। তুমি সুখী হবে।

বৈষ্ণব সাধনার শ্রেষ্ঠ উপায় হল বৈষ্ণব পদাবলীর গান। ভক্তগণ খোল করতাল খঞ্জনি সহ একত্রে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাত তুলে নৃত্য করে গান করে তাকে কীর্তন বলে। এই গানের মাধ্যমে রূপচাঁদ অধিকারী মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন।

'গৌর করে নগর কীর্তন, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ যবন
গৌরসঙ্গেতে
আবাল বৃদ্ধ যুব ছেলে সবাই নেচে হরি বলে।'

এই কীর্তন গানের কয়েকটি শাখার সৃষ্টি হয়। যেমন- গরাণহাটী (গড়ের হাটী), মনোহরশাহী, রেনেটি, মান্দারণী ও ঝাড়খন্ডী। ভক্তের রুচি অনুযায়ী কীর্তন গানের পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে।

কীর্তন গানের রাগ পদ্ধতিকে (সংলাপ সহ গদ্যাকারে বিবৃত) হালকা চালে গাইবার যে রীতি শহর ও গ্রাম গঞ্জে জনপ্রিয়তা লাভ করে তাকে ঢপ কীর্তন বলে। জয় নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধান বিলাস' গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের গানের উল্লেখ আছে।

পদাবলীর কীর্তন গান ধর্ম বিষয়ক অনুষ্ঠান এ পরিণত হয়। এই সকল কীর্তন গানে আঁখরের বোঝা চাপানো হয় ফলে সাধারণ গ্রাম ও শহরের মানুষ কীর্তন গানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারছিল না। সেই সকল গরিব, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বিভিন্ন জাতের মানুষ নতুন কিছুর দিকে মনোরঞ্জন, ধর্মীয় শিক্ষা ও আনন্দ পাবার জন্য আগ্রহ দেখাল। তাঁরা মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য পাঁচালী গান ও ঢপের কীর্তনের দিকে আগ্রহ দেখাল। পাঁচালী, বাউল, অভিনয় উপস্থাপনার বাকপটুতা, ধর্মীয় ভাবনা, ভক্তিরসের সংমিশ্রণ প্রভৃতির সাহায্যে কীর্তন গানের নতুন ধারার সৃষ্টি করেন রূপচাঁদ অধিকারী। তাঁর সৃষ্টির এই নতুন ধারাকে ঢপ কীর্তন বলা হয়। এই নতুন গানের ধারা জনপ্রিয়তা লাভ করে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩১ -১৮৯৪ খ্রিঃ) লেখা 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ও বিশ্বকোষ'এ রূপচাঁদকে শ্রেষ্ঠ ও প্রথম ঢপ কীর্তন গায়ক বলেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কীর্তন গানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- নামকীর্তন বা সংকীর্তন, রসকীর্তন বা পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন এবং সূচককীর্তন।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে মিলে বাহু তুলে নৃত্যরত অবস্থায় বিভিন্ন বাদ্যসহ গানকে নামকীর্তন বলে। পালাকীর্তন হল শ্রী রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন কাহিনী পালার আকারে মঞ্চে গান করা হয়। যেমন- বাসব-সজ্জিকা, অভিসারিকা। এক্ষেত্রে গায়ক বৈষ্ণব পদাবলীকে রাধাকৃষ্ণে মিলন বা বিরহ কাহিনী রূপে উপস্থাপন করেন। যেমন- পূর্বরাগ, মিলন। সূচক কীর্তন হল ভক্ত বা সাধকের বা বৈষ্ণবের তিরোধান উপলক্ষে গাওয়া গান। সনাতন ও রূপগোস্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সূচকপদ রচিত হয়েছিল।

মুক্তলতা বুঝতে পারে সে যথার্থ গুরু পেয়েছে, যাঁর হাতের স্পর্শে সব দুঃখ কষ্ট লাঘব হল। মন আনন্দে পরিতৃপ্ত হল।

গায়ক তাকে অভয় দেয়, বলে তুমি তোমার মনের মত স্বামী পাবে। তা তোমার মনের মানুষের নাম কী?

মুক্তলতা উত্তর দেয়, নয়ন দাস। ডাকাত সর্দার! মুক্তলতা প্রশান্ত মনে নিজ কুঠিরে ফিরে যায়। রূপচাঁদ অনুষ্ঠান করবার জন্য যাত্রা শুরু করে।

শ্রোতার মনের চাহিয়া ও আনন্দ দেওয়ার জন্য তিনি ঢপ কীর্তন প্রবর্তন করেন। পালা গান গাওয়া হত। পালা বা গান শুরুর পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ সংস্কৃত শ্লোক, বক্তৃতা ও ছড়া বা কবিতা বলা হত শ্রোতার অন্তরে প্রবেশ করবার জন্য।

ঢপ কীর্তনে অনেক সময় গায়ক প্রাচীন পদ্ধতি মেনে পায়ে নূপুর ও হাতে চামর-মন্দিরা সহ মুক্তমঞ্চে, বাজারে, হাটে, বটতলায়, জনসমাবেশে, রাজ দরবারে ঢপ কীর্তনের গান গাইতেন। নবীন পদ্ধতিতে গায়কের কোন নির্দিষ্ট পোশাক বা বেশভূষা থাকত না। রূপচাঁদ অধিকারী গানের সহজ-সরল অনুপ্রাস বিজড়িত সুর, ছন্দ সহ বাংলা গানে নূতন উদ্দীপনা ও ব্যাপ্তি প্রচার করেন। তাঁর সৃষ্ট ঢপ গানের রীতি দেশীয় গান, পাঁচালী গান ও বাউল গান নৈকট্যে আনতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে এই গানে

মেয়েদের আধিপত্য দেখা যায়। তিনি খোল, করতাল, খঞ্জনি, একতারা, ডুগরী সহ গান করতেন। তিনি গান শুরু করলে হাটে বাজারে কর্মব্যস্ততা থেমে যেত, মাঝি নৌকা পারাপার করত না। সালারের শিমুলিয়া গ্রামের সংগীত গুরুর দেওয়া ডুবকী বাজিয়ে তিনি গান ধরতেন। শ্রোতার অন্তর পরিতৃপ্ত হত, আনন্দ প্রকাশ করত।

প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছিল-

বাজলো রূপ ঠাকুরের ঢোল
মাগীরা সব চড়কা তোল।

ডাকাত সর্দার নয়ন দাস তার প্রেমিকার সঙ্গে এক গৌর সুন্দর যুবক ব্রাহ্মণের আলোচনা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার অন্তরে প্রতিশোধ স্পৃহা দেখা দেয়। সে ভাবল তার প্রেমিকা তথা ভাবী বধূকে ঐ যুবক ফুসলিয়েছে। গায়ককে হত্যা করার জন্য ডাকাত অস্ত্রসহ অরণ্য পথে অপরাহ্ন বেলায় পথ আটকায়।

গায়ক বলে, আমি এক কৃষ্ণভক্ত গায়ক, আমার পথ আটকিয়ে তোমার কোন লাভ হবে না। আমাকে ছেড়ে দাও। ঐ দূরের গ্রামে সন্ধ্যাবেলায় আমি গান গাইব।

ডাকাত উত্তর দেয়, ডাকাতের ধর্ম হল মানুষ খুন করা, তার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেওয়া। আমি নরঘাতক। তোমার মৃত্যু আমার হাতে। তোমার ঈশ্বর তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

মুর্শিদকুলি খাঁ দক্ষিণ ভারতের এক গরিব ব্রাহ্মণের সন্তান। মাতা মারা গেলে ব্রাহ্মণ বাবা শিশুকে এক ইরানী বণিক হাজিশাফি ইস্‌ফাহানির নিকট বিক্রয় করে দেন। পালক পিতা তার নাম দেন মহম্মদ হাদি। ইরানে পড়শোনা করে দক্ষিণ ভারতে মুঘল দরবারে কাজ শুরু করলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব নাম দেন করতলব খাঁ। পরে সম্রাট তাকে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে পাঠান এবং নাম দেন মুর্শিদকুলি খাঁ। মুখসুসাবাদের নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ (মহাম্মদ হাদি ও করতলব খাঁ) মুর্শিদাবাদ শহর নিজের নামে নামকরণ করে পত্তন করলে ঢাকা শহর থেকে দর্পনারায়ণ রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে বসতি স্থাপন করেন। যোধপুর থেকে আগত হীরানন্দের পুত্র মানিকচাঁদ (শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়) ও মুর্শিদাবাদের মহিমাপুরে বসবাস শুরু করেন এবং শেঠ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মানিকচাঁদ মুর্শিদকুলি খাঁকে সুবাদার প্রাপ্তির জন্য সাহায্য করেন। তিনি মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের দরবারে প্রভাব বিস্তার করেন। এই কারণে নবাব ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে শেঠ উপাধি এনে মানিকচাঁদকে প্রদান করেন। অপুত্রক মানিকচাঁদের (১৭২২ খ্রিঃ) মৃত্যু হলে বোন ধনবাঈএর পুত্র ফতেচাঁদকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। ১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ শাহ তাকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু রিয়াজুস সালাদীন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সম্রাট ফারুকশিয়র ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি দেন। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর জামাতা সুজাউদ্দিন (উপাধি সুজা-উদ-দৌল্লা) নবাব হন। নতুন নবাব ফতেচাঁদকে সম্মান করতেন। সুজা-উদ-দৌল্লা ধর্ম নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন।

হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসের কারণে নতুন নবাব নাজির আহমেদ, মুরাদ ফরাসের প্রাণদণ্ড দেন (রিয়াস-উস-সুলতান)। সুজা-উদ-দৌল্লার মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নবাব হন। নতুন নবাবের সঙ্গে ফতেচাঁদের বিরোধ বাধে। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে (সুতির কাছে) নবাব সরফরাজ খাঁ আলীবর্দী খাঁর (মীর্জা মহম্মদ আলী) হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ফতেচাঁদ আলিবর্দীকে যুদ্ধ ও সুবাদার প্রাপ্তির জন্য সাহায্য করেছিলেন। ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হলে পৌত্র মহাতপচাঁদ জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদ মহারাজ উপাধি পান দিল্লির সম্রাট মহম্মদ শাহর কাছ থেকে। কারণ ফতেচাঁদের তিন পুত্র আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ ও মহাচাঁদ পিতার জীবিতকালে মারা যান। আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হলে নাতি সিরাজ-উদ-দৌল্লা নবাব হন। আলিবর্দী খাঁর তিন কন্যার সঙ্গে বড় ভাইয়ের তিন পুত্রের বিবাহ হয়েছিল। আলিবর্দী খাঁ'র পিতা ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের কর্মচারী ছিলেন। এই কর্মচারীর দুই পুত্র। বড় ছেলের নাম হাজী আহমদ। হাজী আহমদের তিন পুত্র। ছোট ভাইয়ের নাম মীর্জা বন্দি বা মীর্জা মহম্মদ। মীর্জা মহম্মদকে সুজা-উদ-দৌল্লা বিহারের শাসক করেন। এবং আলিবর্দী খাঁ উপাধি প্রদান করেন। আলিবর্দী খাঁ'র তিন কন্যা। হাজী আহমদের বড় পুত্র নওয়াজেস মোহম্মদের (ঢাকার নবাব) সঙ্গে বড় কন্যার ঘষেটি বেগমের বিবাহ দেন। মধ্যম কন্যা 'ময়মানা'র সঙ্গে সৈয়দ আহমদ (পূর্ণিয়ার শাসক) এবং ছোট কন্যা আমিনা বেগমের সঙ্গে জৈনুদ্দিন (পাটনার শাসক) বিবাহ দেন। এই পাটনার (বিহার) নবাব জৈনুদ্দিন বা জয়েনউদ্দীন ও আমিনার পুত্র হলেন মীর্জা মোহাম্মদ। এই দৌহিত্রকে আলীবর্দী খাঁ পৌষ্য রূপে গ্রহণ করেন। ইনিই হলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা। নবাব পদ গ্রহণের পর এই উপাধি পান। পুরো নাম হল নবাব মনসুরোল-মোলক-সিরাজদ্দৌলা শাহ-কুলী খাঁ মিরজা মোহম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর। সিরাজের সঙ্গে মহাতপচাঁদের মনোমালিন্য শুরু হয়। ফলে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের সিরাজের পতন

ঘটে জগৎশেঠ, মীরজাফর প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য।

ইংরেজদের পক্ষ নেওয়ার জন্য মীরকাশেম মহাতপচাঁদকে ও স্বরূপচাঁদকে মুঙ্গেরে হাত পা বেঁধে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলেন। মহাতপচাঁদের পুত্র খোশাল চাঁদকে জগৎশেঠ এবং স্বরূপচাঁদের পুত্র উদয় চাঁদকে মহারাজ উপাধি প্রদান করেন বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। খোশালচাঁদের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃষ্পুত্র তথা দত্তকপুত্র হরকচাঁদকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেছিলেন। এই হরকচাঁদ রূপচাঁদ ঠাকুরের প্রভাবে প্রভাবিত হন এবং বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় বোধহয় রূপচাঁদ ঠাকুর জগৎশেঠ পরিবারের নিকট শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। হরকচাঁদের নামে রূপচাঁদ ঠাকুরের গ্রামের নামকরণ হরেকনগর হয়। হরকচাঁদের পুত্র ইন্দ্রচাঁদকে ইংরেজ কোম্পানি জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেছিলেন। ইনিই শেষ জগৎশেঠ। এই শেঠ বংশের জমিদারি ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল বেলডাঙ্গা, কালান্তর, ভান্ডারদহ ও ডুমনিদহ অঞ্চলে। এই পরিবার ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী পরিবার ছিল। দিল্লির দরবারে তাঁদের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক আধিপত্য ছিল। এই মানিকচাঁদের নামে মানিকনগর, ফতেচাঁদের নামে ফতেনগর, আনন্দচাঁদের নামে আনন্দনগর, দয়াচাঁদের নামে দয়ানগর, স্বরূপচাঁদের নামে স্বরূপনগর গ্রামের নামকরণ হয়েছিল। জগৎশেঠ পরিবারের সময় তাঁদের নৌকা, বজরা প্রভৃতি করে ভারতে ও ভারতের বাইরে বাণিজ্য চলত। বাদশাহী সড়ক পথে ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, উটের গাড়ি ও হাতিতে টানা গাড়িতে করে শেঠরা বাণিজ্য করত। ভাণ্ডারদহ তখন প্রসিদ্ধ বাণিজ্য নগর ছিল।

কৃষ্ণরায়

রূপচাঁদ ঠাকুর বলেন, যখন আমাকে তুমি মেরেই ফেলবে, তাহলে আমার মৃত্যুকালীন ইচ্ছাটা পূরণ করতে চাই।

ডাকাত নয়নদাস জিজ্ঞাসা করে - কী তোমার শেষ ইচ্ছা?

গায়ক বলেন- সে সাধক, গায়ক, সুতরাং তাঁর শেষ ইচ্ছা গান করে তাঁর ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করবে। এরপর যেন তাঁকে হত্যা করা হয়। ডাকাত সর্দার শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য অনুমতি দেন।

গায়ক রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করে ডুবকী বাজিয়ে গান শুরু করেন। রাতের অন্ধকার ভেদ করে গানের সুর প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। কখন ভোর হয়ে যায়। শ্রোতা ডাকাত নয়ন দাসের চোখের জল আসে। সে চোখ বুঝে গানের সুরে নিজেকে নিয়োজিত করে অন্য জগতে চলে যায়। সেখানে আছে শুধু ভালোবাসা, প্রেম, কৃষ্ণনাম। গান শেষ হলে ভোর হয়। পূর্ব আকাশে সূর্য ওঠে। ডাকাত সর্দার বিগলিত হয়ে যায়। গায়কের পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চায়। তার কাজের জন্য অনুতাপ করে। গায়ক ডাকাতকে বুকে জড়িয়ে ধরে; আশির্বাদ করে এবং বলে তার প্রিয়তমা মুক্তলতার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে সংসার করতে।

গায়ক, সাধক, লেখক রূপচাঁদ তাদের বিবাহ দেন। রূপচাঁদ অধিকারীকে তারা গুরুদেব বলে বরণ করেন। নয়ন দাস দস্যু বৃত্তি ত্যাগ করে অহিংসার ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে। গায়ক মহাপ্রভুর বাণী 'বংশমর্যাদা বড় নয়, কর্ম বড়' এই তথ্য সমাজে গানের মাধ্যমে প্রচার করেন।

বেলডাঙা দক্ষিণপাড়ায় রূপচাঁদ ঠাকুরের বাড়ি। বর্তমান তপন রায়, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জীর বাড়ি যেতে গলির দুই পাশে স্থান নিয়ে ঠাকুর বাড়ি ছিল। ফুদনের দোকান থেকে শুরু করে মোড়ল বাড়ি, ঘোষ বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৩০ বিঘা স্থান নিয়ে জমি, বাগান চন্দ্রশেখরদের বাড়ি (রূপলালের বাগান) গৃহ অবস্থিত ছিল। অনেক বাড়িতে পুত্র না থাকায় কন্যার বংশ বাস করে। সতীশ চন্দ্রের গৃহে সেবায়েত রূপে রায় পরিবার, সমেন্দ্রনাথের বাড়িতে রামপ্রসাদ মুখার্জি, সন্তোষ, বিলুরা, নির্মল ব্যানার্জিরা বসবাস করে। বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জিরা পিতা আদ্যনাথ চ্যাটার্জি সেবায়েত রূপে বাড়িতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বসবাস করেন। গরু, ঘোড়া যেখানে থাকত সেটা বর্তমান নিতু, নব গান্ধীদের বাড়ি। রূপলাল ভিটা আগের বাড়ি। বর্তমান অন্য মালিক। আমাদের পূর্বপুরুষদের বাড়ি (সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহ) বর্তমান স্বপন, দিলীপ ব্যানার্জীর বাড়ি। এই বাড়ি থেকে রূপলাল ভিটা পর্যন্ত ছিল আগের বাড়ি। আমার মা পুষ্পরানী চট্টোপাধ্যায়। বাবা রঞ্জিত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য লোক সাহিত্যিক পুলকেন্দু সিংহ আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন।

ঠাকুরদা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সময় (হরেকনগর এএম ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন) সুবোধ ঘোষ

আসতেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা 'রবিবাসরীয়'তে লিখতেন। সুপান্ত ছদ্মনামে কিংবদন্তি'র দেশে বিখ্যাত বই রূপচাঁদ সম্বন্ধে লিখেছিলেন। প্রপ্রপিতামহ শ্রীবল্লভ অধিকারীর সময় নীলরতন মুখোপাধ্যায় ও অনেক লেখক এসেছেন। শ্রীবল্লভের পিতা কানাইলালের সময়ও অনেক গুণীজন এসেছেন। প্রখ্যাত অভিনেত্রী অনুরাধা রায় সীমানা ছাড়িয়ে টিভি সিরিয়ালের অভিনয় করবার জন্য এসেছেন। এঁরা সকলেই মূল বাড়ি অর্থাৎ হরিমতি থেকে দক্ষিণ

*জগমোহনের দারুমূর্তি*

পাড়া আসতে বাম দিকের বাড়িতে এসেছেন। বিপরীত দিকের বাড়িতে আসেননি বরং ঐ বাড়ির অধিবাসীবৃন্দ উক্ত বাড়িটি রূপলালের বাড়ি বলে দাবি করেন নি। কারণ তাঁরা সেই সময় সত্যিটা জানতেন। সত্য ঘটনা সকলে ভুলে যায়, কেউ কোনো খোঁজ রাখে না।

শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সময়ে পরচা বা রশিদ থেকে জানা যায় সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহের উত্তর সীমানায় শ্রীবল্লভ অধিকারীর গৃহ (আমাদের বাড়ি) অর্থাৎ শ্রী শ্রী জগমোহন দেবের বাড়িটা নয়।

ধর্মপদ চ্যাটার্জির পুত্র সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটা দলিল পাওয়া গেছে। দলিলটা লেখার সময় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ১১ কার্ত্তিক। দলিলে দাতাদের নাম গুলো হল- বেলডাঙ্গা নিবাসী শ্রী গৌর গোপাল সাহা মোদক, শ্রী তারাপদ সাহা মোদক, শ্রী কার্তিক চন্দ্র সাহা মোদক, নাবালক পক্ষে অভিভাবক শ্রী কৃষ্ণ গোপাল সাহা মোদক, শ্রী বৃন্দাবনী সাহা মোদক পক্ষে শ্রী কৃষ্ণ গোপাল সাহা মোদক শ্রী হরেকৃষ্ণ সাহা মোদক এবং টিপসহি শ্রী সুধাঙ্গিনী সাহা মোদক। উপস্থিত ব্যক্তিগণ: শ্রী বিধুভূষন দত্ত, হরি নারায়ণ নন্দী ও রাধিকা প্রসাদ পাল।

দলিলে বর্ণনা করা আছে, 'সেবাইত সূত্রে ভোগ দখলকারী আমাদের সকলের অভীষ্ট গুরুদেব শ্রী রামপদ চট্টোপাধ্যায়। আরো লেখা আছে শ্রী শ্রী জগমোহন ঠাকুরের পবিত্র নাম।

যোগেন্দ্রনাথ সাহা এক সময় জীবেন্দ্র শশী গাঙ্গুলিকে বাস্তু জমি দান করেছেন। জীবেন্দ্র পুত্র মন্মথনাথ হল গৌরপদ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা। অর্থাৎ গৌরপদ জামাইকে বাস্তু জমি দান করেননি। উক্ত তথ্যগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শ্রী শ্রী জগমোহন ঠাকুরের মন্দিরটা রূপ ঠাকুরের সময়ের মন্দির নয়। অনেক পরে সাহা মোদক পরিবার সতীনাথ বা তাঁর পুত্র রামপদ অধিকারীকে বাড়ি, মন্দির, জমি দান করেছিলেন। পুরানো বা সাবেক বাড়ি ভগ্নপ্রায় হলে রামপদ অধিকারী দানসূত্রে প্রাপ্ত বাড়িতে যান।

পরম বৈষ্ণব নয়ন দাস মুক্তলতাকে বিবাহ করে সুখে জীবন অতিবাহিত করেন। দাস বাড়িতে কোন মাঙ্গলিক কাজ হলে নয়ন দাসের বংশধরগণ অধিকারী বাড়ির মৃত্তিকা নিয়ে যেত। আমার মা পুষ্পরানী চট্টোপাধ্যায় এ তথ্য ঠাকুরদা'র কাছ থেকে জানতে পারেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সময় পর্যন্ত তাঁরা আসত। আমার কাছে পূর্ব পুরুষদের হাতে লেখা পুঁথি ও কিছু রশিদ এখনো সংরক্ষিত আছে। আজ সব অতীত, ইতিহাস। যে ইতিহাস লুপ্তপ্রায়, কেউ খোঁজ রাখে
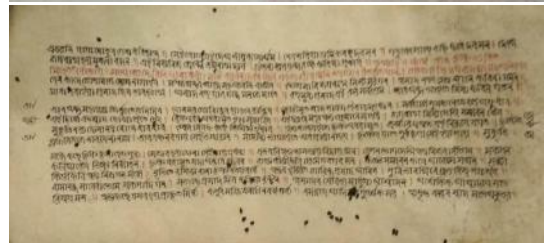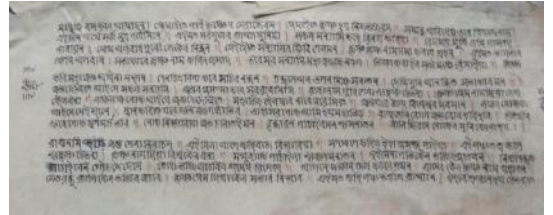
*পাণ্ডুলিপি : রূপচাঁদ ঠাকুরে বংশধরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত*

না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হরিনারায়ণ মণ্ডল (লেখক ও প্রাবন্ধিক), সন্তোষ রঞ্জন দাস (শিশুদা) (লেখক), রাজকুমার শেখ (লেখক, কবি ও সম্পাদক 'জমিন' পত্রিকা), সঞ্জীব প্রামাণিক (চিত্রসাংবাদিক), দীননাথ মণ্ডল (লেখক, সম্পাদক 'সোঁদামাটি' ও 'কথাবার্তা' পত্রিকা), বলরাম হালদার (সম্পাদক- বল্লভ সন্দেশ পত্রিকা), মোঃ দাবিরুল ইসলাম (সাংবাদিক), মহঃ ইনজামাম হাবিব (সাংবাদিক) প্রমূখ ব্যক্তির অতীতের ঘটনাকে সামনে আনবার প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাই।

*ফটোগ্রাফি : লেখক ও সঞ্জীব প্রামানিক*

# পরিবেশের একাল সেকাল

**বিরূপাক্ষ মিত্র**

ছোটবেলায় দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসে মায়ের পাশে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে আকাশ দেখতাম। আকাশের রঙ কি তখন অনেক গাঢ় নীল ছিল? আচ্ছা, আজকাল কেন আকাশের রঙ ওরকম হয় না? শুয়ে শুয়ে দেখতাম অনেক উঁচুতে গোলগোল চক্কর খেত শকুনের দল। আমি মাকে জিজ্ঞেস করতাম "মা, ওরা ডানা ঝাপটায় না কেন? "কিভাবে ডানা না ঝাপটিয়ে ওরা ঘন্টার পর ঘন্টা আকাশে উড়তে থাকে, আমার তা জানার জন্য ছিল প্রবল কৌতূহল। আমাদের বাড়িতে একটা নারকেল গাছ ছিল। সুজাতা মাসি সেই গাছের চারাটা দিয়েছিল। বাড়ির পেছনের একচিলতে জমিতে মাসিই গাছটি লাগিয়েছিল। ধীরে ধীরে গাছটা বড় হয়ে উঠল। আমার স্কুল জীবন শেষ হওয়ার পর থেকেই সেই গাছে নারকেল ধরা শুরু করল। আমি আর গাছটি যেন একসাথেই পাশাপাশি বড় হয়েছি। মা বলতেন, "তোরা দুই ভাই। এক সাথেই বড় হয়েছিস। ভাই-এর যত্ন নিবি।" আমারও যেন কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। কলেজে পড়াকালীন মাঝে মাঝে সার দিতাম নারকেল গাছটার গোড়ায়। একদিন লক্ষ্য করলাম যে গাছে একটা ছোট কোটর রয়েছে। সেখানে একটা কাঠঠোকরা পাখি থাকে। এমনি করে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। তারপর মা আমার হঠাৎই চলে গেলেন। আর অদ্ভুতভাবে গাছটিও ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগল। এবং খুব অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে গাছটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেল। মায়ের চলে যাওয়াটা আমি মেনে নিতে পারিনি। আজও পারি না। কিন্তু গাছটির শুকিয়ে যাওয়ার বিষয়টির সঠিক ব্যাখ্যা আজও পাই না। মা গাছটিকে পুত্রসম স্নেহ করতেন। তাহলে কি আমার মতই গাছটিও মায়ের চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারেনি? আমি জানি আমার এই ব্যাখ্যা কেউ মানবেন না। কিন্তু আমি মনে প্রাণে এই কথাই বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি মা গাছটিকে যতটা ভালবাসতেন, গাছটিও মাকে ততটাই ভালবাসত। গাছেদের অনুভূতি আমাদের মানুষের থেকে কোন অংশে কম নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে বেশিই। আজকাল মানুষের অনুভূতিগুলো মরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কিন্তু গাছের অনুভূতি তা সত্ত্বেও আজও রয়েছে। এত অত্যাচার করে চলেছি আমরা পরিবেশের ওপর। গাছ কিন্তু তাও ফল, ফুল, ছায়া প্রদান করা আজও বন্ধ করে দেয়নি। তবে মনে হয় আর বেশি দেরি নেই। এবারে পরিবেশের প্রত্যাঘাতের সময় হয়েছে। আমরা যদি এখনও সামলে না উঠি, তাহলে আর আমাদের সুযোগ নেই। লোভের গতিতে যদি আমরা হ্রাস টানতে না পারি, আমাদের ধ্বংস শুধু সময়ের অপেক্ষা। এখানে আরও একটা ব্যাপার না বললেই নয়। বাড়ির নারকেল গাছটা মারা যাওয়ার পরও কিন্তু সেই কাঠঠোকরা পাখিটা অনেক দিন ছিল। আমি লক্ষ্য রাখতাম। সে ওই মরে যাওয়া গাছটির কোটরে ডিম পেড়েছিল। সেই বাচ্চাগুলো বড় হল এক এক করে, তারপর একদিন উড়ে গেল। কাঠঠোকরা পাখিটা অবশ্য তারপর আর ফিরে আসেনি।

কমন মারগানসার (ফিমেল)
(গাজলডোবা জলাভূমি)

আমাদের বাড়ির দোতলায় সামনে এবং পেছনে দুটো বারান্দা। দিনের আলো যখন ফুরিয়ে আসত রোজ লক্ষ্য

করতাম সামনের বারান্দার ঘুলঘুলিতে দুটো চড়াই পাখি আসত। রাতে চুপি চুপি গিয়ে দেখতাম যে ওরা নিজেদের শরীরে পালকের মধ্যে মুখগুঁজে ঘুমিয়ে থাকত। শীতে আমাদের ওখানে খুব ঠান্ডা পড়ত। সন্ধ্যা থেকেই কুয়াশা ঢেকে ফেলত চারিপাশ। শীতের দিনগুলিতে আমার ছোট বোন বলত, "দাদামণি, ওদের খুব ঠান্ডা লাগে রাতের বেলা। ওদের তো লেপ বা কম্বল নেই। আমরা ওদের একটা লেপ বানিয়ে দিতে পারি না রে?" আমি ওর কথা শুনে হাসতাম। তবে আমারও কিন্তু মনে হত যে ঠান্ডায় ওরা কষ্ট পায়। এখনো আমার মনে হয় যে শীতকালে ওরা সত্যি কষ্ট পায়। এর মাঝে অনেকগুলো দিন কেটে গিয়েছে। সিভিল সার্ভিসে আসার পরে কোলকাতার সল্টলেকে প্রসাশনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমাদের দীর্ঘ ছয়

কমন মারগানসার (মেল)
(গাজলডোবা জলাভূমি)

মাস ট্রেইনিং হয়েছিল। সেখানে ডাইনিং হলের পাশে সারিসারি দেবদারু গাছ রয়েছে। ঝাঁকড়া গাছ। শেষ বিকেলে সেখানে চড়াই পাখিদের তুমুল হল্লা শুনতে পেতাম। ধীরে ধীরে রাত পড়তে শুরু করলে তাদের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেত। সবশেষে একদম নিঝুম। এক রাতে আলতো করে ডালপালা সরিয়ে দেখেছিলাম ঝাঁকে ঝাঁকে চড়াই একে অপরের সাথে গায়ে গা লাগিয়ে নিজেদের শরীরের নরম পালকে মুখ ঢুকিয়ে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। কি দারুণ সেই দৃশ্য। আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। কিন্তু আজকাল আর চড়াই পাখি চোখে পড়ে না। এক নিমেষে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে চড়াই পাখির দল অদৃশ্য হয়েছে ভোজবাজীর মত। আমরা নিজেদের জীবনে নিজ নিজ কাজে এত ব্যস্ত যে চড়াইদের কথা ভাবার অবকাশ পাইনি। চড়াই পাখিরা থাকল কি থাকল না, আমাদের এই গতিশীল জীবনে আদৌ কি তা নিয়ে চিন্তা করার মত ফুরসত রয়েছে? আমরা তো ভালই আছি। বরং ভালই হয়েছে। বাড়ির ঘুলঘুলি আর ভেন্টিলেটর গুলোতে আর কেউ বাসা বানায় না। ঘরবাড়ি পরিষ্কার থাকে। তাই না?

বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার অভ্যেস আমার অনেক দিনের। আমার দাদুর কাছে একবার শুনেছিলাম হাড়গিলে পাখির কথা। নাম শুনেই হাড় হিম হয়ে গিয়েছিল। কি সাংঘাতিক নাম রে বাবা। সেইসব পাখিরা নাকি স্বাধীনতার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে ভেসে বেড়ানো লাশের ওপরে নৌকাবিহার করত। আর তাদের সাথে থাকত শকুনের দল। তারা লাশ ঠুকরে ঠুকরে খেত। সে ছিল নাকি এক বীভৎস দৃশ্য। পরে যখন হাড়গিলে পাখির ছবি দেখলাম, বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। সত্যিই সাংঘাতিক চেহারা তাদের। আজকাল আমরা আর তাদের তেমন দেখতে পাই না। চোখে পড়ে না আমার দেখা সেই নীল আকাশের বুকে গোল করে চক্কর মারতে থাকা শকুনের দল। আচ্ছা, আমাদের কি একবারও মনে হয়েছে যে এই হাড়গিলে আর শকুনেরা আজ কোথায় চলে গিয়েছে? কেন আজ তাদের আর আমরা দেখতে পাই না? আরে না না। আমাদের অত সময় কথায়? আমি নিজে ভাল আছি কিনা সেটাই আমার কাছে বড় কথা। হাড়গিলে, শকুনের মত অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমাদের মাথা ব্যথা না থাকাই উচিত। আচ্ছা, আমরা কি এটা ভেবেছি কখনো যে এরা কি সত্যিই অপ্রয়োজনীয়? বোধ হয় ভাবিনি। আর ভেবে থাকলে আজ তারা এত বিরল হত না বোধ হয়।

চাকরির শুরুতে বিডিও হিসাবে আমার প্রথম

রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড (মেল)
(গাজলডোবা জলাভূমি)

পোস্টিং হয় শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে। ব্লক অফিস থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরেই ছিল এক বিশাল জলাভূমি। সবাই ফুল বাড়ি নামে চেনে। শুনেছিলাম সেখানে নাকি শীতকালে অনেক পরিযায়ী পাখি আসে। ছুটির দিনে চলে যেতাম সেখানে। পাশেই ছিল সেচ দপ্তরের কন্ট্রোল রুম। ওখানকার মানুষের সাথে আড্ডা মারাটা আমার সাপ্তাহিক কাজের মধ্যে একটি হয়ে পড়েছিল। কথায় কথায় শুনেছিলাম সেচ দপ্তরে বাসুদেব বন্দোপাধ্যায় নামক এক পাগল ব্যক্তি আছেন যিনি কাজ কর্ম ভুলে স্থানীয় মানুষজন ও মাঝি, যারা মাছ ধরে

ফুলবাড়ির জলাভূমিতে, তাঁদের সাথে প্রায়ই নাকি বাগ-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একটু অবাক হলাম। এ আবার কি? খুব অল্পদিন বাদেই আমার বাসুদেব বাবুর সাথে পরিচয় হয়ে গেল। দেখলাম উনি সত্যি বদ্ধ উন্মাদ। আমায় বললেন, "এই ফুল বাড়ির জলাভূমিতে প্রতি শীতে প্রায় ১৫,০০০ পাখি আসত। কিন্তু ইদানিং তারা খুব কম আসে। স্থানীয় লোকজন পাখি শিকার করে খেয়ে নেয়। মাঝিরা খুব সরু জালের নেট লাগিয়ে মাছ ধরে। এতই সরু সে জালের সুতো, যে খুব ছোট মাছেরাও তার থেকে রেহাই পায় না। জলে ডুবে ডুবে যে সব পাখিরা মাছ ধরে, তারা সেই জালে জড়িয়ে গেলে আর ছাড়া পায় না। তাদের ঝটপটানি দেখে বাকি পাখিরা ভয়ে উড়ে পালিয়ে যায়। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে অনেক ধরনের ছোট মাছ এককালে খুব মিলত। এদের মধ্যে ছিল মহাশোল, বোরোলি, পাথরচাটা, খড়কে বাটা প্রভৃতির মাছ। আজ তারাও বিরল। এই জলাভূমিতে এক সময় সেই সব মাছের আধিক্য ছিল। আমি এই সবের বিরুদ্ধে কথা বলি তো, তাই সব্বাই আমাকে বলে, ওই যে পাগল বাসুবাবু যাচ্ছে।" অবাক হয়ে ওনার কথা শুনছিলাম। ভারি অদ্ভুত মানুষ তো! ছুটির দিনে শিলিগুড়ি থেকে গাছের চারা কিনে

বার হেডেড গুজ
(ফুলবাড়ি জলাভূমি)

এনে বাঁধের ধারে লাগাতেন বাসুদেব বাবু। রোজ গিয়ে জল দিতেন। মাটি খুঁচিয়ে দিতেন। বলতেন, "একদিন এই গাছগুলো বড় হবে। তখন অনেক পাখি এখানে বসবে। বাসা বাঁধবে।" তা এই লোকটি পাগল নয় তো কি? এই সব লোক সত্যিই বেমানান। খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এই সব করে বেড়াচ্ছেন। আমাদের বেশির ভাগই এমনটাই ভাবব। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে দেখব যে এমন আরও অনেক বাসুদেব বাবুরা আছেন বলেই এই পৃথিবীটা আজও সুন্দর। আজও পরিবেশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। আমরা কেন সবাই পারি না এই বাসুদেব বাবুদের মত পাগলামি করতে? আমি এই প্রশ্নের উত্তর পাইনি। খুব কষ্ট হয় যখন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারি যে প্রাচীন জলাশয়গুলিতেও আজ মানুষের লোভের দৃষ্টি পড়েছে। জলাভূমি বুজিয়ে আধুনিক টাউনশিপ গড়ে তোলা একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। আচ্ছা, ওই জলাভূমিগুলি বুজিয়ে ফেললে যে পাখিরা ওখানে প্রতি শীতে আসত, তারা কোথায় যাবে? কেউ ভাবেনি। ভাবেও না বোধ হয়। আমাদের বাড়িঘর যদি কেউ এইভাবে দখল করে নিত? আমরা কি তবে চুপ করে বসে থাকতাম? পশু-পাখিরা কথা বলতে পারে না বলে আমরা কি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি? আমরা কি সেই সুযোগটাই নিচ্ছি? ধীরে ধীরে শহরের সব জলাশয়গুলি হারিয়ে যাচ্ছে। এর

গ্রেল্যাগ গুজ
(গাজলডোবা জলাভূমি)

বিরুদ্ধে বাসুদেব বাবুর মত কিছু মানুষ লড়ছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা সীমিত এবং তাঁরা দুর্বল। সেই তিন বছর কেটেছিল ভারি অদ্ভুত ভাবে। বাসুদেব বাবুর সাথে মিলে স্থানীয় মানুষকে সচেতন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। মাঝিদের পাখি চেনানোর চেষ্টা করেছিলাম। পাখি শিকার বন্ধ করার একটা প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। জলাভূমির আশেপাশে শীতকালের পিকনিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এ তো গেল আমরা কি করেছিলাম। এবারে প্রশ্ন হল এত কিছু করে কি পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, পাখিরা ফিরে এসেছিল। ২০১৬ সালের বিগ বার্ড ডে-তে আমরা হিসাব করে দেখেছিলাম প্রায় ৩০,০০০ পাখি এসেছিল সেবারে। এর থেকে বড় পরিতৃপ্তি আর কি হতে পারে!

এবারে ফিরে আসি সেই প্রসঙ্গে যা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। চড়াই পাখিরা কোথায় গেল? সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। শহুরে অঞ্চলে আজকাল নতুন নতুন বাড়িগুলিতে চড়াইদের থাকার মত ঘুলঘুলি তৈরি করা হয় না। বেচারা পাখিরা থাকবে কোথায়? চড়াই পাখিরা সাধারণত ঝোপে-ঝাড়ে ছোট ছোট পোকামাকড় খায়। শহরে বড় বড় গাছ তো রয়েছে, কিন্তু সেখানে চড়াই পাখিরা তাদের খাবার খুঁজে পায় না। তারা সেখানে থাকেও না। তাদের থাকার জায়গা হল গেরস্ত বাড়িতে। কিন্তু সেখানেও যে তাদের

থাকার জায়গা নেই। এর মধ্যে শহরের আনাচে-কানাচেতে মোবাইল টাওয়ার বসেছে। আমাদের গন্ডারের চামড়াতে সেই টাওয়ার থেকে বের হওয়া রেডিয়েশন হয়ত ততটা ক্ষতি করতে পারে না, আর পারলেও তা হয়ত খুব ধীরে ধীরে করে। কিন্তু ছোট্ট চড়াইরা এই রেডিয়েশন সহ্য করতে পারে না। তাদের আয়ু ও প্রজনন ক্ষমতা, দুই-ই কমে যায় বহু গুণ। গ্রামাঞ্চলে আজও চড়াইরা আছে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। ধীরে ধীরে কি তাহলে চড়াই পাখিও বিলুপ্তির পথে? আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কি তাদের আদৌ দেখতে পাবে? নাকি কেবল বইতেই তাদের ছবি দেখে চিনবে যে এক সময় চড়াই নামের একটি ছোট্ট পাখি আমাদের দেশে ছিল। আজ তারা বিলুপ্ত। আমাদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর নেই। বিগত তিন দশকে একই ভাবে শকুনের সংখ্যাও অপ্রত্যাশিত ভাবে কমে গিয়েছে। এরা জমাদার পাখি। মৃতের দেহ মুহূর্তে এরা খেয়ে পরিষ্কার করে দেয়। অন্যথায় এই পচা দেহে বহু ধরনে জীবাণু জন্মায় যা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। শকুনের পাচনতন্ত্র খুবই জটিল যা সব ধরনের জীবাণুকে খুব সহজেই হজম করে ফেলতে সক্ষম। কিন্তু এই পাখি উপকারী হলেও আজ কেন বিলুপ্তির পথে? শকুনের দল মূলত মৃত গবাদি পশুর দেহ খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু এই গবাদি পশুর শরীরে প্রচুর পরিমাণে ডাইক্লোফেনাক নামক এক প্রকার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই ওষুধ মুলত ব্যথা কমানোর কাজে ব্যবহৃত হত। মৃত পশুর শরীরে এই ওষুধের রেশ রয়ে যায়। আর এই ওষুধই হল শকুনের পক্ষে মারাত্মক বিষ। ৯৯% শকুনের মৃত্যুর কারণ হল এই ডাইক্লোফেনাক। বছর সাতেক আগে এই ওষুধ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজও সেই নিষিদ্ধ ওষুধ গবাদি পশু শরীরে নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেই প্রায় পাঁচটি আলাদা প্রজাতির শকুন দেখতে পাওয়া যায়। বরং বলা ভাল যে, আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই ভাবেই একে একে আরও কত যে প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তা আমরা হয়ত অনেকেই জানি না। পাঠকদের অনুরোধ রইল একবার গুগুলে গিয়ে একটু সময় নিয়ে ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীদের ছবি একটু ঘেঁটে দেখলে চমকে উঠবেন। হলফ করে বলতে পারি যে অনেকেই সেই তালিকায় থাকা অনেক প্রাণীর ছবি দেখা তো দূর, হয়ত নামই শোনেন নি।

আজ আমাজনের জঙ্গলে দাবানল ধ্বংসের লীলায় মেতে উঠেছে। শুনেছি পৃথিবীর মোট ২২% শ্বাস নেওয়ার অক্সিজেন নাকি এই জঙ্গল থেকেই উৎপত্তি হয়। সারা বিশ্ব এই নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু যাদের জঙ্গল, তাঁরাই নাকি সুখ নিদ্রায় মগ্ন। ব্রাজিল সরকার কারও সাহায্য আশা যেমন করে না, তেমনি তাঁরা কারও সাহায্য পেতে আগ্রহীও নয়। জানি না মানুষের বোধোদয় আর কবে হবে। কবে যে আমরা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বুঝতে শিখব। হয়ত সময়ই এর উত্তর দিতে পারবে। কিন্তু ততদিন কি এই সুন্দর পৃথিবীটা আদৌ আর বাসযোগ্য থাকবে? পাঠকদের একটু গভীরে গিয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব।

*ছবি : লেখক*

টাফটেড ডাক
(ফুলবাড়ি জলাভূমি)

# সুনামি এবং আমাদের ভাবনা

**মহঃ সেলিম**

পৃথিবী ভেসে চলেছে মহাশূন্যে। চালক সূর্য নামে পরিচিত একটি নক্ষত্র। সূর্য ছুটে চলেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তার সৌর পরিবারকে নিয়ে। মহাবিশ্বের সব কিছু প্রসারিত হচ্ছে। আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আবার পৃথিবীপৃষ্ঠ ভেসে চলেছে কতগুলি অবতল নৌকার মত প্লেটে চড়ে। এই নৌকাসম প্লেটগুলির সংঘাতেই ঘটেছে ২০04 সালের ২৬শে ডিসেম্বরের সুনামি। ছিনিয়ে নিয়েছে বহু প্রাণ এবং সম্পদ। কোনও দিন হয়তো মহাশূন্যে ভাসমান অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ বা নক্ষত্রের সংঘাতে আমাদের ভালবাসার এই সৌর সংসার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে এই নীল গ্রহ, খড়কুটোর ছাইয়ে পরিণত হয়ে থেকে যাবে অসীম মহাশূন্যে। তার আগেই সাবলীল সবুজ সত্যনিষ্ঠ করে রাখা। আমরা তা পারছি কি? চারিদিকে নরখাদক, স্বার্থান্বেষী শ্বাপদের চলাফেরা এবং তার পদশব্দ স্পর্শ। একে প্রতিহত করতে হবে। নইলে আমরাই আমাদের বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়াব।

সুনামি শব্দটির সাথে আমাদের তেমন কোন পরিচিতি ছিল না। কিন্তু গত ২০04 সালের ২৬শে ডিসেম্বরের ভোর সকালের অভিজ্ঞতা বলছে আমাদের সামনে যেন আর সুনামির তাণ্ডব না ঘটে। 'সুনামি' একটি জাপানি শব্দ। 'সু' মানে ‘বন্দর’ এবং 'নামি' মানে ‘ঢেউ’। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতেন যেসকল মৎস্যজীবী তাঁরাই লক্ষ্য করেছিলেন গভীর সমুদ্রে জলের ঢেউ আপাতত নিরীহ থাকলেও বন্দরের গায়ে আছড়ে পড়ছে সেই ঢেউ বিশাল আকারে। ভূমিকম্প, ধ্বস, উল্কাপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মত বড়সড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সমুদ্রের কোনও অংশের বিপুল জলরাশি স্থানচ্যুত হয়, তখনই উৎপত্তি হয় সুনামির।

সুনামি সৃষ্টি হওয়ার পরেই সমুদ্র জল ঢেউয়ের আকারে প্রচণ্ড গতি নিয়ে ছুটে এসে হাজার হাজার মাইল দূরে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে। গভীর সমুদ্রের ঢেউয়ের ব্যবধান থাকে দীর্ঘ অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় বেশি। কিন্তু উচ্চতা হয় অনেক কম। ফলে জাহাজ বা স্যাটেলাইট থেকে সমুদ্রের অস্বাভাবিকতা স্বাভাবিক চোখে ধরা পড়ে না এবং তেমনভাবে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু এই ঢেউ -ই তারপর ঘন্টায় ৫০০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে পাড়ি দিতে থাকে। সমুদ্রের গভীরতা যত কমতে থাকে ঢেউয়ের গতিবেগ ততই বাড়তে থাকে এবং একই সঙ্গে উচ্চতা বাড়তে থাকে। অগভীর সমুদ্রের ঢেউ যে গতিতে পাড়ি দেয়, তা অভিকর্ষজ ত্বরণ এবং জলের গভীরতার গুণফলের বর্গমূলের সমান।

অগভীর সমুদ্রে জলের ঢেউয়ের গতিবেগ (v)

$= \sqrt{\text{অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)X জলের গভীরতার মান (h)}}$

ধরা যাক, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে জলের উচ্চতা 4000 মিটার

অতএব গভীর সমুদ্রে $v = \sqrt{9.8m/s^2 \text{ X } 4000m}$

অগভীর সমুদ্রে গভীরতা যদি 40 মিটার হয় তাহলে

অগভীর সমুদ্রে $v = \sqrt{9.8m/s^2 \text{ X } 40mt}$

$= 20 \text{ mt/s} = 72\text{km/hour}$

অর্থাৎ গভীর সমুদ্রের ঢেউয়ের গতিবেগ 720km/hour হয়ে যাবে। এবং তার সাথে সাথে গতিশক্তির বেশ কিছু অংশ বিশাল পরিমাণ জলকে ঢেউয়ের আকারে উপরের দিকে তুলে ধরে স্থিতিশক্তিতে পরিণত হয় এবং অবশেষে 10 মিটার থেকে 40 মিটার উচ্চতার ঢেউ আছড়ে পড়ে তীরে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় স্থলভাগ। সৃষ্টি করে এক কঠিন পরিস্থিতি, যা মোকাবিলা করা একটি রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুনামিকে ভালোভাবে জানতে গেলে পৃথিবী নামক সূর্যের এই গ্রহটিকে ভালোভাবে জানা দরকার। জানা দরকার তার গঠন এবং তার অন্দোলন। সুনামির বীজ বপন হয়েছিল কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টির প্রাক্কালে। মহাবিস্ফোরণের পর (aftet Big-Bang) নেবুলা নামক গ্যাসপিণ্ড নিজের কেন্দ্রের অভিকর্ষের প্রভাবে ফিউসন (fusion ) বিক্রিয়া শুরু করে, প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি করে এবং জন্মায় নতুন নক্ষত্র। তারই চারপাশে সৃষ্টি হয় তাকে ঘিরে গ্রহ-পৃথিবীও ছিল একটা উত্তপ্ত সৌরপরিবার। অর্থাৎ পৃথিবীও ছিল একটা উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড, তারপর তাপ বিকিরণ করে ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠ যত তাড়াতাড়ি CRUST হিসাবে কঠিন আকারে পরিণত হল তত তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করতে না পেরে পৃথিবীর অভ্যন্তর উত্তপ্ত এবং গলিত অবস্থায় থেকে গেল। এই অর্ধগলিত (Semiliqued and lequid) পদার্থের মিশ্রণকেই বলা হয় Mantle বা Magma-এর উপরে ভাসছি আমরা, আমাদের এই পৃথিবীপৃষ্ঠ, ঘরবাড়ি, সমুদ্র, নদ-নদী-নালা-পুকুর-ডোবা ইত্যাদি। আলফ্রেড ওয়াগনার

নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী একদিন ভোর সকালে পৃথিবীর মানচিত্র দেখছিলেন। হঠাৎ দেখলেন আশ্চর্য তো! Atlantic Occean-এর দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকুল রেখা এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকুল রেখার তটভূমির খাঁজগুলো এমনই এরা যেন এক সঙ্গে জোড়া লেগে ছিল। তাহলে কি মহাদেশগুলো কোনও এক সময়ে পরস্পর জোড়া লাগা অবস্থায় সংলগ্ন ছিল? পরে কোনও কারণে ভেঙে গিয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে?

নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন ব্রাজিল এবং আফ্রিকার প্রাচীন জীবাশ্মের সাদৃশ্য বর্তমান। যেমন এক ধরনের সীড ফার্ণ 'Glossopteris'-এর জীবাশ্ম দেখা গেছে ভারতে, সাউথ আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং সাউথ আমেরিকায় এমনকি Antarctic মহাদেশেও। 'Mesosaurus' নামে একটি মিষ্টি জলের প্রাণীর ফসিল ব্রাজিল এবং সাউথ আফ্রিকাতে পাওয়া গেছে। নিশ্চয় তারা সাঁতরে Atlantic পারাপার করেনি। কারণ তারা সাঁতার জানে না। আবার জীবন্ত এক ধরনের কেঁচো আফ্রিকা এবং আমেরিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। এটাও কল্পনারও অতীত তারা এতদূর সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে।

বিভিন্ন মহাদেশের শিলাস্তরের গঠন প্রকৃতি, বয়স এবং Magnctic Property-র সাযুজ্য প্রমাণ করে অতীতে সকল মহাদেশ একই সঙ্গে পরস্পর যুক্ত ছিল। পরে তারা বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়ে চলতে আরম্ভ করে এবং চলছেও, আর সেই চলার পথেই ঘটে যায় এই ভয়ঙ্করতম প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আমরা কি তাকে রুখতে পারি?

মহাদেশগুলো যে বেগে পরস্পর সরে যাচ্ছে তার গতিবেগ, যে হারে আমাদের হাতের আঙুলের নখ বাড়ে তার মত। সে কারণে কোনও একটি মানুষ তার জীবৎকালে এটা তেমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। যেমন ইউরোপ এবং আফ্রিকা থেকে আমেরিকা প্রতিদিন সরে সরে যাচ্ছে। ইন্ডিয়া উত্তর দিকে সরে গিয়ে এশিয়াকে ঠেসে ধরছে এবং ফলে হিমালয় পর্বত তৈরি হয়েছে এবং হিমালয় তার উচ্চতা বাড়িয়েই চলেছে। আফ্রিকা মহাদেশ ধীরে ধীরে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরছে এবং অবশেষে স্পেনকে ছুঁবে। এই গতির ফলে পর্ব আফ্রিকা বাকি আফ্রিকা থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এবং সেই জায়গায় ঢুকে পড়বে সমুদ্র। ICELAND-এর Laki fissure-এর দিকে তাকালে দেখা যাবে দুই ভূখণ্ড পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রায় 2 X $10^8$ বছর। আগে মোট ভূখণ্ড একসঙ্গে লেগে ছিল তাকে বলা হয় PANGEA ।

পৃথিবীর উপরের কঠিন আবরণটিকে বলা হয় লিথোস্ফিয়ার। এই স্তরটি মোট বৃহৎ ১৬টি খণ্ডে বিভক্ত। যেমন- ভারতীয় প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট ইত্যাদি। এদের আবার কিছু উপপ্লেটে ভাগ করা হয় যেমন ফিজিমাইক্রোপ্লেট, বার্মা মাইক্রোপ্লেট ইত্যাদি। ২৬শে ডিসেম্বর ভারতীয় প্লেট তিন তিনবার বার্মা প্লেটের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। তার ফলেই হয়েছিল ভয়ংকর ৯ রিখটার মাত্রার ভূমিকম্প এবং তারই ফসল সুনামি।

আসলে পথিবীর ভূত্বকের নীচে গলিত ম্যাগমা যখন লাভা আকারে শৈলশিরাগুলোর মাঝ বরাবর বেরিয়ে আসে তখন প্লেট গুলোর সরণ ঘটে। কারণ গলিত ম্যাগমা বের হয়ে এলে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় তাকে তো পূরণ করতে হবে। শূন্য থাকা তো সম্ভব নয়। তাই প্লেটগুলোর সাবডাকশন হলে, ওই প্লেটের সাবডাকটেড পার্ট গলে গিয়ে ম্যাগমায় পরিণত হয়। এবং এইভাবে রক-ম্যাগমা-রক চিত্র সম্পূর্ণ হয় এবং পৃথিবী তার তাপবিক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ রাখে। এইভাবে একদিন যখন পথিবী তার তাপশক্তি বিকিরণ করে ফেলবে, প্লেট নেমে যাবে। ভূত্বকের নীচের জল জমে বরফ হয়ে যাবে। উদ্ভিদ এবং আমরা বাঁচব না। ভাবতেই ভয় লাগে। রক সাইকেলের ফলে ম্যাগমাতে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং তারই জেরে প্লেটগুলোর মুভমেন্ট চলতে থাকে। শৈলশিরাগুলো হল বিভিন্ন প্লেটের সংযোগরেখা। লাভা বের হবার ফলে সমুদ্রতলের প্রসারণ ঘটে। কিন্তু পৃথিবীর আয়তন তো প্রসারিত হচ্ছে না। তাই প্লেটগুলো হয় সামনা সামনি, পাশাপাশি, আড়াআড়ি বিভিন্নভাবে বল প্রয়োগ করে এবং সহ্যসীমা (Elasticts) অতিক্রম করলে বৃহৎশক্তি ভূমিকম্প রূপে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে অথবা সমুদ্রতলে এবং তারই ফলে সৃষ্টি হয় সুনামির।

দুটি প্লেটের গতির ফলে যে কৃন্তন পীড়ন সৃষ্টি হয় এবং ক্রমাগত পীড়ন বাড়তে থাকায় এক সময় ইলাস্টিক লিমিট ছাড়িয়ে গেলে প্লেট দুটি চ্যুতি ঘটায় বা একটি প্লেট অপর প্লেটের নীচে চলে যায়। ফলে যে বিপুল গতিশক্তির নির্গত করে তা কিছুটা তাপশক্তিতে পরিণত
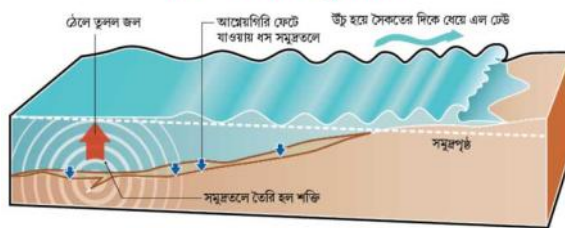
হয় এবং কিছুটা প্রস্তরখণ্ডকে উপরের দিকে, পাশের দিকে তুলে ফেলে দেয়। তার ফলে ভূকম্পন হয়, যা তরঙ্গ শক্তি রূপে উপরের ভূতলে ফাটল ধরায় ধ্বংস কার্য সম্পন্ন করে। সমুদ্রতলে এই চ্যুতি হলে ভয়াবহ সুনামির সৃষ্টি হয়।

একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। ভূমিকম্প মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু সব ভূমিকম্পের বেলাতেই জলকম্প হয় না বা তেমনভাবে হয় না কেন? ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে দূরতম প্রান্তে পুকুর, নদী, ডোবার জল কাঁপতে থাকে কেন? উদ্বেল হয়ে ওঠে কেন? ব্যাপারটা হল সিসমিক ওয়েভের সারফেস ওয়েভ অংশ ভূমিকম্পের ফোকাস থেকে যত দূরে সরে যায় ততই এটা আনিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ বা সারফেস-এর দিকে উঠে যেতে থাকে সারফেস ওয়েভের শেষ প্রান্তটা যখন সারফেস বা ভূপৃষ্ঠের
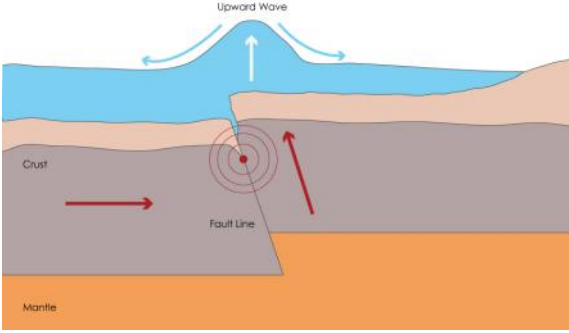
কাছাকাছি চলে আসে, তখন ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন জলের স্থিতিস্থাপকতা কম এবং মাটির সঙ্গে আলগাভাবে আবদ্ধ থাকার অন্য জল কাঁপতে থাকে। মাটির নীচে বাড়ির গাঁথনির ভিত থাকায় বাড়িটা কম কাঁপে কিন্তু মাটির উপরে এস-ওয়েভ-এর প্রাপ্ত থাকায় জল আন্দোলিত হয়।

বর্তমানে সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে মাপতে পারি। সিসমোগ্রাফ হল একটি সরল পেন্ডুলাম। যখন ভূমি কেঁপে ওঠে তখন যন্ত্রের বেস এবং ফ্রেম কেঁপে ওঠে, কিন্তু জাড্যের কারণে পেন্ডুলামের বব নিজের স্থানে ফিরে আসতে চায়। ফলে পেন্ডুলাম কম্পিত ভুমির সাপেক্ষে দুলতে থাকে। যতই দুলতে থাকে ততই পেন্ডুলাম সময়ের সাথে সাথে তার স্থান পরিবর্তনকে রেকর্ড করে ফেলে। এই রেকর্ড হয়ে যাওয়া চিত্র বা তথ্যকে সিসমোগ্রাম বলে। ত্রিমাত্রিক চিত্র পাওয়ার জন্য একটি সিসমোগ্রাফ স্টেশনে তিনটি পেন্ডুলাম থাকে। এই ত্রিমাত্রিক তথ্যের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের চরিত্র দুরত্ব, দিক, মাত্রা, পরিমাপ করতে পারেন। ভারতে ১৩১ টি এমন স্টেশন রয়েছে।

ভূমিকম্পের ফলে উৎপন্ন তরঙ্গকে বলা হয় ভূকম্পনজাত তরঙ্গ বা সিসমিক ওয়েভ। একে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটি হল বডি ওয়েভ এবং অপরটি হল সারফেস ওয়েভ। বড়ি ওয়েভকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, একটি প্রাইমারি এবং অপরটি সেকেন্ডারি ওয়েভ বা পি-ওয়েভ এবং এস-ওয়েভ। পি-ওয়েভ কঠিন এবং তরলের মধ্যে দিয়ে দ্রুত যেতে পারে। কিন্তু এস-ওয়েভ কেবলমাত্র কঠিনের মধ্যে দিয়ে যায় এবং খুব স্লো। পি-ওয়েভ মাধ্যমকে কম্পিত করে দলের ঢেউ-তরঙ্গের মত যায়। এস-ওয়েভ ছড়িয়ে কম্পনের মত যায়। সারফেস ওয়েভ ভূত্বকের উপরিভাগ দিয়ে সঞ্চারিত হয়।

Seismic Waves

| Body Waves | Surface Waves |
|---|---|
| P-Waves | S-Waves |
| (fast) | (Slow) |
| জলের ঢেউয়ের মত | দড়ির কম্পনে মতো |
| (কঠিন এবং তরলে যেতে পারে) | (কেবলমাত্র কঠিনে /অর্ধ তরলে যায় । তরলে যায় না ) |

সিসমোগ্রাফের কাজ হল ভূকম্পন কোথায় হয় তা চিহ্নিত করা। এই জন্য তিনটি স্টেশন এর দরকার হয়। স্টেশনগুলোতে পি-তরঙ্গ যখনই পৌঁছায় তখনই সেই সময়টাকে নোট করা হয়। পি-তরঙ্গের তুলনায় এস-তরঙ্গের গতিবেগ কম হওয়ায় একটু পরে এস-তরঙ্গ স্টেশনে ধরা পড়ে। এর ফলে পি এবং এস এর মধ্যে সময় পার্থক্য এস-পি টাইম পাওয়া যায়। এস-পি টাইমকে
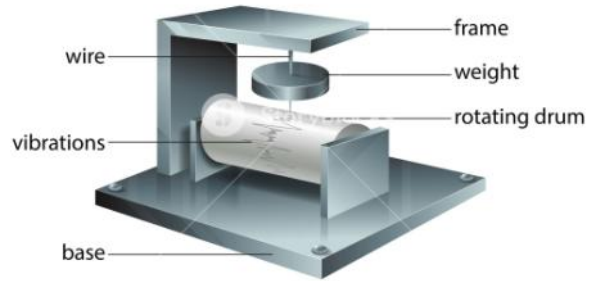
৮ কিমি/সেকেন্ড দিয়ে গুণ করলে স্টেশন থেকে কত দূরত্বে ভূকম্পনের এপিসেন্টার আছে তা জানা যায়। কিন্তু দিকটা বলা যায় না। দিক পেতে গেলে ৩টি স্টেশন থেকে এস-পি টাইম থেকে প্রাপ্ত দূরত্বের ব্যাস নিয়ে তিনটি বৃত্ত আঁকতে হবে। এই বৃত্ত তিনটি যেখানে পরস্পর ছেদ করবে সেটিই হবে ভূকম্পনের এপিসেন্টার। এপিসেন্টারের নীচে মাটির তলে কেন্দ্রবিন্দুকে বলা হয় হাইপোসেন্টার।

ধরা যাক, এস-পি টাইম পার্থক্য হয়েছে ৬ মিনিট। অর্থাৎ পি-ওয়েভ আসার ৬ মিনিট পর এস-ওয়েভ এসেছে। তাহলে ভূকম্পনের এপিসেন্টার হবে

S-P line X 8 Km/S

= 6X60 Second X 8 Km/S

= 360X8Km/S = 2880Km.

অর্থাৎ স্টেশন থেকে ২৮৮০ কিমি দূরত্বে ভূকম্পনের কেন্দ্রটি রয়েছে। এবার তিনটি স্টেশন থেকে ২৮৮০ কিমি ব্যাস নিয়ে তিনটি বৃত্ত।

পৃথিবী পৃষ্ঠের কত নীচে কেন্দ্রটি রয়েছে অর্থাৎ হাইপোসেন্টারটিকে জানতে হলে পি-তরঙ্গ এসেছে ধরা গেল 8.10 Z.M এ। এই পি-তরঙ্গ হাইপোসেন্টারের নীচে গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে আবার সেকেন্ড টাইম যখন স্টেশনে ধরা পড়বে তা নোট করা হয়। এই টাইম পার্থক্যকে বলে পি পি তরঙ্গ টাইম পার্থক্য। এই পার্থক্য যতই বাড়বে গভীরতা ততই বাড়বে। Pp time পার্থক্য এবং পূর্ব থেকে গণনা করা টেবল থেকে গাণিতিক উপায়ে আমরা হাইপোসেন্টার বা ভূমিকম্পের ফোকাস জানতে পারি।

সুনামিকৃত ঢেউ উপরে উঠে পাখির ঠোঁটের মত বেঁকে তীরে আছড়ে পড়ার কারণ হলে — তীরের কাছে এসে ঢেউয়ের উচ্চতা ১০ মিটার থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই বিশাল পরিমাণ জলের স্থিতিশক্তি, গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তীরে আছড়ে পড়লেই নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী তীরও সমান এবং বিপরীতমুখী বল সমুদ্রের দিকে ক্রিয়া করে। এই বলের দুটি উপাংশের একটি F Sinθ পুণরায় তরঙ্গের আকারে পূর্বে আগত জলের তরঙ্গের সহিত সমাপতিত (Superimposed) হয়ে তাকে উচ্চতায় আরও বৃদ্ধি করে দেয়। অপর উপাংশ F Cosθ নীচের দিকে মাধ্যম তথা জলকে টেনে নিয়ে আসতে চায়। এই কারণে ঢেউয়ের আকৃতি আছড়ে পড়ার আগে পাখির ঠোঁটের আকার নেয়।

পি এবং এস তরঙ্গের সাহায্য আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন জানতে পারি। কারণ আজ পর্যন্ত মানুষ পৃথিবীর কেন্দ্রের নমুনা আনতে পারে নি। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা গভীর গর্ত করা হয়েছে রাশিয়ার কোলা পেনিনসুলাতে, তাও মাত্র ১২ কিমি। যেটা পৃথিবীর কোরে যাওয়ার পথের মাত্র ০.২ শতাংশ। তাই পৃথিবীর ভিতরের খবরাখবর আমরা পরোক্ষভাবে জেনেছি পি এবং এস ওয়েভ-এর মাধ্যমে।

বিজ্ঞানীরা যান্ত্রিকভাবে ভূমিতে কম্পন সৃষ্টি করে বড়ি ওয়েভ তথা পি এবং এস-ওয়েভ পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং এই তরঙ্গগুলির গতির লেখচিত্র আঁকেন। দেখা যায় ৩০-৪০ কিমি পর্যন্ত যাওয়ার পর পি এবং এস তরঙ্গের গতিবেগ হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানী মোহরোভিসিস-এর নামানুসারে এই তলের নাম দেওয়া হয়েছে Mohorovicic Discontinuity বা 'Moho'। এরপর প্রায় ৭০ কিমি যাওয়ার পর উভয় তরঙ্গের বেগ কমে যায় একে বলে লো ভেলোসিটি জোন। এরপর আরও প্রায় ২৯৪০ কিমি যাওয়ার পর পি তরঙ্গের গতিবেগ একেবারে কমে যায় এবং এস-তরঙ্গ ফিরে আসে। একে গুটেনবার্গ বলে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় - (i) 0-40 kr. পর্যন্ত CRUST (ii) 40-2940 Kr. পর্যন্ত Mantle (iii) 2940-6271 kr. পর্যন্ত CORE (Solid)।

সমুদ্রের তীর হতে গভীর সমুদ্র কত দূরে, তা আমরা মনে মনে সবাই ভেবে থাকি। আসলে দেশের ভূখণ্ড হতে জানি আস্তে আস্তে ২০০ মি. পর্যন্ত গভীর হয়েছে। এর দুটি ভাগ, প্রথমটি Continental Shelf অল্প গভীরে আর দ্বিতীয়টি Continental Slope বেশ গভীর। দ্বিতীয় ভাগটি হঠাৎ শেষ হয় এবং চলে আসে গভীর সমুদ্র যার গড়পড়তা গভীরতা ১৫০০ মিটার। এই Continental Shelf টা যতবেশি হবে ততই সুনামির ঢেউ-এর ঘর্ষণ বেশি হবে এবং শক্তি ক্ষয় হবে, একই কারণে ঢেউয়ের তীব্রতা কমবে। অর্থাৎ Continental Shelf যত ছোট হবে সুনামীর তীব্রতা তত বাড়বে। সেই লক্ষ্য করা গেছে ২৬শে ডিসেম্বর সুনামির ক্ষেত্রে। ভারতের এবং শ্রীলঙ্কার যে তীরে সুনামি ধ্বংসলীলা চালিয়েছে সেই তীরের Continental Shelf মাত্র ৩০-৪০ কিমি। এরপরই সমুদ্র ১০০-২০০০ ফ্যাদম গভীর। ভারতের পশ্চিম উপকূলের সেল্ফ প্রায় ৪০-৩৩০ কিমি।

Continental Plate এর মুখোমুখি পীড়নের ফলে যে দুটি বড় মাউনটেন্ড তৈরি হয়েছে তার একটি আগেই বলেছি হিমালয় পর্বতমালা এবং অপরটি হচ্ছে আল্পস পর্বতমালা। আফ্রিকা এবং ইউরোপ প্লেটের সারণীতে।

সুনামির এই ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচার জন্য মানুষের কি কিছুই করার নেই? হ্যাঁ আছে। বেশির ভাগ সুনামি ঘটে থাকে প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে তাই (PTWC) The Pacific Tsunami Warning System স্থাপন করা হয়েছে হাওয়াই দ্বীপে ১৯৪৯ সালে। এই সিস্টেম ১৯৫২ সালে সুনামির পূর্বাভাস দিয়ে হনুলুলুর বহু মানুষকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল। PTWC-এর সদস্য ছিল ২৬টি দেশ। মধ্যমণি অবশ্যই আমেরিকা। সেই কারণে বহু সংখ্যক Deep-Ocan Assesment and Reporting of Tsunami (DART) প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে।

সমুদ্রতলের মাটিতে একটি চাপমাপক যন্ত্র (BPR)

Sea floor bottom Pressure Recording (BPR) system রাখা হয় সেটি সমুদ্রতলের জলের সাহায্য চাপের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং সেটিকে বুঝে শব্দ তরঙ্গাকারে পরিবর্তিত করে সমুদ্র জলে ভাসমান বয়াতে রক্ষিত হাইডোফোনে পাঠায়। বয়াতে রক্ষিত কম্পিউটার সিস্টেমে ওই সংকেতকে পুনরায় ভূসমলয়কক্ষে ঘূর্ণয়মান নির্দিষ্ট উপগ্রহে পাঠায়, উপগ্রহ ওই সংকেত গ্রহণ করে ভূপৃষ্ঠে রক্ষিত বিভিন্ন সুনামি ওয়ার্নিং স্টেশনে পাঠায়। সুনামি ওয়ার্নিং স্টেশনগুলি তখন নির্দিষ্ট দেশের জনগণকে অবহিত করে যে সুনামি আসছে। এর ফলে মানুষের জীবনহানি অনেক কম হয় বা হতে পারে। কিন্তু ভারত, শ্রীলঙ্কা, সুমাত্রা, সোমালিয়া এই দেশগুলি সুনামির খবর জানতে পারে নি। কারণ তারা পয়সা দিয়ে ওই সংস্থার সদস্যপদ নিতে পারেনি। শুধু তাই নয় ভারত সরকারের জি এস আই তখন কি করছিল। সুমাত্রার পাশে সমুদ্রতলায় যখন ৯ রিখটার স্কেলে ভূকম্বন হল তখন তা পি এবং এস ওয়েভ-এর মাধ্যমে ভারতের সিসমোগ্রাফ স্টেশনে নিশ্চয় ধরা পড়ল। তখন ছিল সকালবেলা ৬.১৫ অথবা ৬.২০। তাহলে জি এস আই কাজ করল না কেন? আসলে সিসমোগ্রাফ যন্ত্রগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সারাদিন-রাত সিগন্যাল রেকর্ড করে যায় এবং তার থেকে কন্টিনিউয়াস প্রসেসে ডেটা বের হতে থাকে। সকাল ৬.১৫ অথবা ৬.২০ সেই ভূকম্পের ডেটা কম্পিউটার আনলোড করে দিয়েছিল কিন্তু তা দেখার মত সেখানে বিশেষজ্ঞ লোক ছিল না। বিশেষজ্ঞ লোকেরা/চাকুরিজীবীরা তখন বাড়িতে ঘুমিয়েছিলেন। যখন ১১টার সময় অফিসে পৌছালেন তখন দেখলেন আরে ৯.৭ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প হয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে। ততক্ষণে গোটা পৃথিবী জেনে গেছে কী তাণ্ডবই না ঘটে গেছে। জি এস আই করল কি তাড়াতাড়ি সেই খবর বিজেপি আমলের মন্ত্রীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেও কিন্তু নির্দিষ্ট দপ্তরের ঠিকানাটাও জানা হয়ে ওঠেনি। যাক জি এস আই বলে আমরা জব্বলপুরের স্টেশন থেকে ১ মিনিট ৫৩.৯ সে. এর মধ্যে খবর জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু তিনটি স্টেশনের সমন্বয় সাধনের ক্রুতি থাকার জন্য এপিসেন্টারকে চিহ্নিত করতে পারিনি। সমুদ্রে সুনামি সৃষ্টি হওয়ার পর ঘণ্টায় ৫০০ কিমি গতিবেগে তীরের দিকে ধাবিত হয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ভারতে এবং শ্রীলঙ্কা আছড়ে পড়ল। তাহলে এই দেড়ঘণ্টা সময় ভারতের জনগণ পেয়ে যেত, যার ফলে মানুষেরা অন্তত বেঁচে যেত, সম্পদ না বাঁচাতে পারলেও। এর দায় কে নেবে? তাহলে কি ধরে নেবো না মানুষও এর জন্য সমান দায়ি।

শুধু তাই নয়, সুনামির ঢেউ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, আন্দামান ধ্বংস করে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মূল ভূখণ্ডে আঘাত করার খবর প্রত্যক্ষ করেও কোনও সতর্কবার্তা দেওয়া হল না কেন? এই আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে আন্দামানে অবস্থিত ভারতীয় বিমান বাহিনীর দপ্তর ধ্বংস হল এবং তাঁরাও কি ভারতের রাজধানীতে সরকারকে খবর দেয়নি। ভাবতেও কষ্ট লাগে কি অব্যবস্থা, শৃঙ্খলাহীনতা এবং দায়িত্বহীনতার মধ্যে দিয়ে আমরা জীবনপাত করে চলেছি। ঝড়, বৃষ্টি এবং অন্যান্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার মত সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার প্রযুক্তি বিজ্ঞান করায়ত্ব করার পরও এত মানুষের জীবনহানি হল কেন? কে জবাব দেবে? আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি গবেষণা কেন্দ্র থেকে এই তথ্য ভূমিকম্পের জানার পর তার সদস্য রাষ্ট্র থাইল্যান্ডকে ১৮ মিনিটের মধ্যে জানিয়ে দেয়। এর পরেও থাইল্যান্ড তার জনগণকে সতর্ক করেনি। মার্কিন পুঁজি দ্বারা চালিত এই কেন্দ্রগুলি ভালোভাবে জানতে পারে সুনামি। আসছে, তবুও তারা মানবিকতার নজর দিয়ে সকল রাষ্ট্রগুলোকে জানালো না। তাহলে আমেরিকা পৃথিবীর মানুষের জীবনকে শুধুমাত্র টাকা এবং মুনাফার নিরিখেই বিচার করে? বর্তমানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি নেতারা অনেক বড় বড় কথা বলছেন, কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে বড় বড় ত্রাণ পুনর্বাসনের খাত নির্দিষ্ট করেছেন। শুধু বলা হচ্ছে দান কর, টাকা দাও, ট্যাক্স ছাড় নাও ইত্যাদি। এতসব জানার পরও আমরা এখনও চুপ করে বসে থেকে সব কিছুরই সঙ্গে আপস করবো? ভাবতে হবে সকলকে? শুধুমাত্র সিসমোগ্রাফ যন্ত্র, সুনামি-নির্ণায়ক যন্ত্র ছাড়াও এই পরিবেশে অসংখ্য প্রাণী তাদের অভিজ্ঞতা এবং সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে জানতে পারে সুনামি, ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। চীনে এ ব্যাপারে গবেষণা করা হয়েছে। যেমন কুকুরেরা তাদের বাসা ছেড়ে বিপদজনক এলাকা থেকে বেরিয়ে চলে আসে। নেকড়ে বাঘ, শৃগাল নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পালিয়ে যায়। সমুদ্রের হাঙর, সিগাল অস্বাভাবিক আচরণ করে। চিড়িয়াখানার পশুপাখিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। পিঁপড়েরা গর্ত থেকে বের হয়ে আসে। সাপ শীতকালের শীত ঘুম ছেড়ে তিনদিন আগে বাইরে চলে আসে। কুকুর, গরু, ঘোড়া, পায়রা অস্বাভাবিক আচরণ করে। এসব লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে চীনের বিজ্ঞানীরা ১৯৭৫ সালে জানুয়ারির মাঝামাঝি বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস করেন। এর ফলে লাললিং প্রদেশ এবং হেইচিং প্রদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বিকালে ৭.৩ রিখটার স্কেলের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। সম্পদ নষ্ট হলেও, মানুষের প্রাণ বেঁচে যায়। ১৯৭৬ সালের ২৪শে

জুলাই কান্তকেচাঙ গণিকমিউনে তাংসান শহরের অদূরে পশুখামার থেকে ঘোড়া এবং খচ্চরগুলি দড়ি ছিঁড়ে চলে যায় এবং তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটে। পায়রা তার পায়ের টিবিয়া বা ফিবুলা অংশের সূক্ষ্ম নার্ভের সাহায্যে ভূকম্পের আগের সংবেদন ধরতে পারে। এখন যদি ওই নার্ভের নকল করে কৃত্রিম রিসেপ্টার তৈরি করা যায় তাহলে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। অথবা পায়রার পায়ে কম্পিউটার চিপস বসিয়ে তার থেকে সিগন্যাল নিলে দেওয়া যেতে পারে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। কুকুর ভূমিস্তরের সূক্ষ্ম ফাটলের কম্পন ধরতে পারে। ক্যাটফিস ভূকম্পের আগে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের পরিবর্তন ধরতে পারে। এদের নিয়ে গবেষণা করলে ভবিষ্যতে আমরা হয়তো জীবনহানি কম করতে পারব।

টেকটনিক প্লেটগুলির মধ্যে যে স্ট্রেস সৃষ্টি হয় তা ধরে ধীরে সহনশীলতা অতিক্রম করলে ঘটে যায় বিপর্যয়। আমরা প্লেটগুলোর সংলগ্ন রেখাগুলোকে চিহ্নিত করতে পেরেছি। এখন ওই স্ট্রেস এলাকায় পাম্প করে জল তেল ঢুকিয়ে দিলে পিচ্ছিল হবে এবং ঘর্ষণ কমে যাবে, একই কারণে। স্ট্রেস কমে যাবে তাই মৃদু ভূ-কম্প হবে। তবে ব্যাপারটি বিপদজ্জনকও হতে পারে। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা করা দরকার এবং এটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার কারণ টেকটনিক প্লেটগুলোর সীমানা তো আর কোনও দেশে সীমাবদ্ধ নেই। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছে না, কারণ হল এতে বিনিয়োগ করলে ফেরতলাভ তাদের নাও হতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি গবেষণা কেন্দ্র স্থলে সুনামি সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ২৬টি দেশ সদস্যপদ নিয়েছে সদস্য-ফী দিতে হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে মুনাফালোভী শকুন, শ্বাপদের দল আসরে নেমে পড়েছে। যারা বিশ্বায়নের কথা বলে তারা বিশ্বায়নের বিপদের, দুঃখের, ব্যাথার ভাগ নিতে রাজি নয়। শুধু লাভের গুড় চটকে নিতে রাজি। আমাদের স্বাবলম্বী হতে হবে। দায়িত্বশীল, সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। তাহলে পারব প্রকৃতি এবং সমাজকে রক্ষা করতে। নইলে কথায় বলা হবে, কাজে কিছু হবে না। যারা ভূকম্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভয় পাচ্ছেন, তারা তো জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পারমানবিক, হাইড্রোজেন বোমা ফাটাতে ভয় পান না। ইরাক, আফগানিস্তান, যুগোস্লোভিয়া, পালেস্টাইনে বিধ্বংসী মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে, লক্ষ লক্ষ শিশু, মানুষ মারতে ভয় হয় না। বিপদ শুধু আন্তর্জাতিকভাবে বিপদের, দুঃখের, ব্যথার মোকাবিলা করতে।

আমরা যতই একে হবেই বলে ধরে নিই। তা মনে হয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ জলে, স্থলে এমন কোনও বিপর্যয় ঘটে না যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ অবশ্যই মানবজাতির হাতে থাকে। এই পৃথিবী, মানুষ জীব, জড়, পশু, পাখি, উদ্ভিদ সমস্ত কিছু একটা ব্যালান্সড সিস্টেমে চলে। তাকে ইকো সিস্টেম বলে। এখন এই সিস্টেমের ব্যাঘাত যদি মানুষ ঘটায় তাহলে সিস্টেম নিজেই সেই কারণকে প্রতিহত করার জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাবেই। তার জন্য প্রকৃতিকে দোষ না দিয়ে নিজেদের দোষ শুধরে নেওয়াই ভালো, নইলে নিস্তার নেই। ভারত সরকার তার ১৩১টি সিসমোগ্রাফ যন্ত্রকে যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করাতে পারত তাহলে ইন্দোনেশিয়া থেকে ঢেউ আসতে দেড় ঘণ্টা সময়ে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচানো অবশ্যই যেত। আজ যেখানে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় খবর সংগ্রহ করা যায়। এরপরেও কি এই সুনামিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুকে গণহত্যা বলব না। এর পরেও এই খুনিরা দেশের মানুষের কাছে দান চায়, খয়রাত চায় বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে। এবং এই দান দেবে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, মজুর সবাই। সরকার আবার সেসও বসাবে। টাকার হরির লুট হবে। লুটের ভাগ বাটোয়ারা হবে। কারণ এই তহবিলের অডিট হয় না। প্রশ্ন করার কেউ নেই। এ এক পরিহাস।

একমাত্র সেই দিনই মানুষ তার কষ্টের লাঘব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে যখন সকল মানুষ সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবান হবে। শোষণ বন্ধ হবে। শোষকের হাত থেকে শোষিত মুক্ত হবে। বিজ্ঞানকে নিয়ে সমগ্র মানবকল্যাণে ব্যবহার করে প্রত্যেকের স্বাধীনতা এবং অধিকারের মর্যাদা দিলে মানুষ মনুষ্যত্বে উন্নীত হবে। বিপদ কাটবে। বিপর্যয় কমবে। তাই প্রকৃতির প্রতিটি এলিমেন্টের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে আমাদের ক্রুটি হলে প্রকৃতি তার পরিশোধ নেবেই। আমরা মানুষেরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার্থে প্রকৃতিকে নির্বিচারে ধ্বংসের যজ্ঞে নেমে পড়েছি এবং তার প্রতিযোগিতাও করছি। এ জিনিস থামতে হবে। প্রকৃতির যত্ন আমাদের নিতে হবে। আমাদেরই রক্ষার্থে, বিকাশের লক্ষ্যে, উন্নতির কাজে আমরা যা কিছুই করি না কেন তা যেন কারও শান্তিকে বিঘ্নিত না করে। কারণ, তা হলে আমরা মানবতার শত্রুতে পরিণত হব।

*ছবি : ইন্টারনেট*

# বিশ্বের ভয়ঙ্কর আগাছা - পার্থেনিয়াম

মোজামমেল সেখ

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এলিয়েন প্রজাতির আগাছা হল পার্থেনিয়াম। যে আমাদের চোখের সামনে দ্রুত বংশ বিস্তার করে চলেছে আমাদেরই অজ্ঞতার সুযোগে। পার্থেনিয়ামের ক্ষতির দিকটি জানলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। অথচ ছোট ছোট সাদা ফুলের এই গাছটি দেখলে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আগাছা বিশেষজ্ঞ স্টিভ এডিকিনিফ-এর মতে দশ মিটার দূর থেকে এই গাছের ফুলের রেণু মানুষের অ্যালার্জি, হাঁপানি, চর্মরোগ সৃষ্টি করতে পারে।

**গাছটা দেখতে কেমন?** পার্থেনিয়াম গাছের পাতা দেখতে অনেকটা হাইব্রিড ধনেপাতার মতো। ঝাঁকড়া, ঝোপালো, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদটির পাতা গাজর গাছের পাতার মতো দেখতে বলে স্থানীয় মানুষ একে 'গাজর ঘাস'ও বলে থাকেন। গাছগুলি উচ্চতায় ১ থেকে ১.৫ মিটার (৩-৪ হাত) পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা শাখাযুক্ত ত্রিভুজের মতো। নির্দিষ্ট বয়সে বিয়ে বাড়িতে সাজানো 'জিবসি ফুলের' মতো ছোট ছোট ফুল হয়। গাছটি সাধারণত তিন থেকে চার মাস বাঁচে। এই সময় কালে পার্থেনিয়াম তিনবার ফুল ও বীজ দেয়। এক একটি গাছ থেকে চার থেকে পঁচিশ হাজার পর্যন্ত বীজের জন্ম দিতে পারে।

**বিস্তার :** পার্থেনিয়ামের মূল উৎপত্তিস্থল মেক্সিকো হলেও বর্তমানে এই বিষাক্ত আগাছা ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, চীন নেপাল, বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এই উদ্ভিদের বীজ এতটাই ছোট এবং অভিযোজনশীল যে সাধারণত গাড়ির চাকার কাদামাটি, গবাদি পশুর মল, পথচারির জুতোর তলায় লেগে থাকা মাটি, সেচের জল ও বাতাসের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

**ভারতে আগমন :** বিষাক্ত এই আগাছা ১৯৫০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা PL 480 গমের দূষক হিসেবে ভারতে প্রবেশ করানো হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বর্তমানে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এই আগাছা বিস্তার লাভ করেছে। এর ফলে ভারতের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০ বিলিয়ন ডলার (২০১২ সালে প্রাপ্ত তথ্য) এমনকি পুনেতে পার্থেনিয়ামের বিষক্রিয়ায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

**পরিচিতি :** পার্থেনিয়াম ডেইজি (Daisy) পরিবারের মধ্যে সূর্যমুখী উপজাতির উত্তর আমেরিকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের একটি বংশধর।
বিজ্ঞান সম্মত নাম - পার্থেনিয়াম হিসটারো ফোরাস (Parthenium hysterophorus)।
পার্থেনিয়াম নামটি গ্রিক শব্দ 'পার্থেনাস' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যার অর্থ 'ভারজিন' অর্থাৎ কুমারী।

**শ্রেণীবিন্যাস :** রাজ্য (Kingdom): প্ল্যান্টি অর্থাৎ উদ্ভিদ
গোত্র (Order) : অ্যাস্টারলেস (Asterales)
পরিবার (Family) : অ্যাস্টারেসি (Asteraceae)
গন (Genus) : পার্থেনিয়াম (Parthenium)
প্রজাতি(Species): হিস্টারোফোরাস (hysterophorus)

**অন্য নাম :** গয়েউল, ওল্ডমিসা, গাজর ঘাস, তেতো আগাছা, তারা আগাছা, সাদাশীর্ষ, বুনো ফিভারফিউ,

ভারতের বিপর্যয়, কংগ্রেস ঘাস প্রভৃতি নামে পরিচিত।

**কোথায় দেখা যায়?** পার্থেনিয়াম বর্তমানে বিশ্বের সাতটি সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক এবং বিপদজনক গাছের মধ্যে একটি। এই ক্ষতিকারক আগাছা প্রায়শই রাস্তার দু'পাশে পরিত্যক্ত জমি, কবরস্থান, শ্মশান, রেলপথ, শহরতলীর আশপাশ, আবাসিক উপনিবেশ, নদীবাঁধ, নিকাশি নালা, সেচখাল, বন্ধ কারখানা, শস্যক্ষেতে, হসপিটাল ইত্যাদি স্থানে দেখা যায়।

**ক্ষতিকর দিক : (ক) মানুষ :** অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, হে ফিভার, হাঁপানি, অ্যালার্জি, ক্ষতসহ চর্মরোগ, একজিমা, ত্বক ক্যান্সার বিষক্রিয়ার কারণে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, হাত পা লাল হয়ে যাওয়া ও চুলকানি, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগ মানুষের মধ্যে হয়।

**(খ) গবাদি পশু :** পশুদেরও মানুষের মতোই সব রোগ হতে পারে। তাছাড়া পার্থেনিয়াম আগাছা যুক্ত স্থানে গবাদিপশু চরানো হলে শরীর ফুলে যাওয়া, তীব্র জ্বর সহ নানা রোগে আক্রান্ত এবং বদহজম হয়। শুধু তাই নয় গাভীর দুধ তেতো হয়ে যায়, যা দীর্ঘ সময় পান করলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

**(গ) ফসল :** ফসলের উপরেও পার্থেনিয়ামের ব্যাপক ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়। এ গাছের রেণু বাতাসে মিশে টমেটো, ভুট্টা, লঙ্কা ও বেগুনের ফুল ঝরিয়ে ফসলের ক্ষতি করে। ভুট্টার ক্ষেতে এ আগাছা ফল ধরার পর প্রাথমিক অবস্থায় মোচার ফল ধারণক্ষমতা ৩০% হ্রাস করে। ধান, গম, ছোলা, সরিষার ক্ষেতে এই আগাছা বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ও বৃদ্ধি কমে দিয়ে ফলন ব্যাহত করে। এর থেকে নিঃসৃত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ডাল জাতীয় ফসলের গাছের নাইট্রোজেন তৈরিতে সাহায্যকারী রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়াকে অকার্যকরী করে দেয়। তাহলে সহজে অনুমান করা যাচ্ছে পার্থেনিয়ামের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা।

**বিষের রাসায়নিক প্রকৃতি :** পি. হিস্টেরোফোরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, টাইকোমস এবং পরাগ সহ সমস্ত অংশে 'সিস্কুইটারপিন ল্যাকটোনস' (SQL) নামক বিষ বা টক্সিন রয়েছে। রিপোর্ট বলছে, এতে একটি তিক্ত গ্লাইকোসাইড পার্থেনিন রয়েছে যা একটি প্রধান SQL। এই SQL গঠিত হয় ক্যাফিক অ্যাসিড, ভ্যানেলিক অ্যাসিড, আনসিক অ্যাসিড, প্যানসিক অ্যাসিড, কোরোজেনিক অ্যাসিড ও কিছু অজানা অ্যালকোহল দ্বারা।

**প্রতিকারের উপায় :** (i) কোন যানবাহন আগাছার জঙ্গল দিয়ে যাতায়াত করলে তা ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।
(ii) পার্থেনিয়াম আক্রান্ত রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়, যা পার্থেনিয়াম গাছ থেকে তৈরি করা হয়েছে।
(iii) অসুবিধা বুঝলেই দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
(iv) নিয়মিতভাবে আগাছা দমন করতে হবে।
(v) ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে।

**আগাছা দমন পদ্ধতি :** (১) আগাছার জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে পোড়ানোর সময় রেণু দূরে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত বংশ বিস্তার ঘটাতে পারে এবং মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষতি করতে পারে। তাই আগাছাগুলিকে ফুল ফোটার আগে তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
(২) গাছ কেটে গভীর গর্তে ফেলতে হবে।
(৩) আগাছানাশক ব্যবহার করে দমন করা যায়। এক্ষেত্রে ব্রোমাসিল, ডাই-ইউরোন, টারবাসিল প্রতি হেক্টরে **১** কেজি ৫০০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে প্রতি হেক্টরে ৩ কেজি লবণ চারশো লিটার জলে গুলে প্রয়োগ করা।
(৪) জৈবিক পদ্ধতিতে নানা ধরনের পাতা খেকো বা ঘাস খেকো বিটল পোকা দ্বারা দমন করা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
(৫) ফুল ফোটার আগে আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে।

**সতর্কতা :** গাছ কাটার সময় বিশেষ কতগুলো সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে- গ্লাভস, মুখোশ, চশমা পরে নিতে হবে। পা ভালো মতো মোটা কাপড়ের প্যান্ট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে, সঙ্গে বুট জুতো।

**শেষকথা :** মজার ব্যাপার হলো পার্থেনিয়ামের কিছু ঔষধি গুন আছে। এই গাছ থেকে মানুষের প্রবল জ্বর, বদহজম, টিউমার, আমাশা সহ নানা ধরনের জটিল রোগের প্রতিষেধক তৈরি হচ্ছে। তবু বলবো, এই গাছ বাড়তে না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করাই ভালো। নইলে স্থানিক প্রজাতির উদ্ভিদ, গবাদি পশুর পাশাপাশি মানুষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। বাস্তুতন্ত্রে জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হবে। গবেষণা যদি করতেই হয় তাহলে নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের মধ্যে বিশেষ সতর্কতার সাথে করতে হবে। সরকার তথা জনগণের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ- আসুন 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের ঝাঁটার পাশাপাশি কাস্তেও ধরি - যাতে ঘাতক এই উদ্ভিদ প্রজাতিকে সমূলে বিনষ্ট করতে পারি।

## বেদবাক্য

**অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়**

আমি যে ছন্দছাড়া
কী ভীষণ ছন্নছাড়া
বিদ্যালয়ের অবিদ্যাধর স্নাতক

জেদি আর একলষেঁড়ে
এ বছর এরই জোড়ে
মেরেছি উঃ থেকে আহ্ তক্

মেটেনি চায়ের খিদে
আবারও চাইছি, টি দে,
আসলে একটু হলেও চাতক

দু'বেলা খাচ্ছি বসে
পাতে ভাত-মাংস কষে
প্রভু জানেন, আমি হলাম পাতক

তুই কী দুইচারিণী
তবুও হাল ছাড়িনি
তুই যে আমার প্রথম ও শেষ ঘাতক

হেরেছি কালির কাছে
সেঁকছি বর্ণ আঁচে
বঙ্গভাষার কাছেই কেবল খাতক

সুতরাং অধমর্ণ
ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণও
আমার কোনও জাত নেই, আমি জাতক

## খাদ্য ও অন্যান্য

**হামিদা কাজী**

নুরুল ইসলাম ভাত চেয়েছিল,
গুলি খেয়েছিল।
এই দৃশ্য সারা পৃথিবীর।
রোহিঙ্গা শিশু অথবা পাশের বাড়ির।

জীবন্ত রুগ্ন শিশুর পিছনে হাঁটে
শকুন।
তার পিছনে শিকারি সাংবাদিকের ক্যামেরা।
বিপুল জয়ধ্বনি বিশ্বজুড়ে, পুরস্কার।

যন্ত্রণায় তিল তিল করে মরে সাংবাদিক।

শিশুটির কি মৃত্যু হয়েছিল, আর শকুনটি কি তাকে...?
আজ আর কেউ জানি না।
ওদের খবর তো খবর হয় না।
শুধু জানি পুলিৎজার পুরস্কার আর এক সাঁইত্রিশ বৎসরের
তরুণ সাংবাদিকের মৃত্যু।

নুরুল ইসলামদের কেবল ভাত দরকার না কি গুলি ও?

## নোঙর

**অলক্তিকা চক্রবর্তী**

শুধু হাওয়াটুকু ধার করে আমি ওতপ্রোত
বন্ধু হবি, ও নবীন মেঘ বিগলিত

যেদিক ই ভাসুক দোলাক মনন ছুঁইয়ে যাক
সবটুকু শেষ আমাতেই মেশ নিরিচ্চার

হাত ধুয়ে বসে বেলা অবেলায় সেই রাখাল
ননি দিয়ে মুখে কথা বলে গেছে মুগ্ধ জাল

তোর সাথে আসা বাড়তিটুকুই জাগায় লোভে
বন্দর খুঁজে ফিরে যাব একা, এতো সহজ?

# মাছরাঙা বিকেল
## তৈমুর খান

আমার মাছরাঙা বিকেলটির কথা কেউকে বলিনি
রোদের নৌকায় ভেসেছি তীব্র জলে
স্রোত ছিল, স্রোতে এক কাহিনিও...

ভিরু দিন, মুখ ঢেকে এসেছিল কাছে
তার হাতে স্বপ্নমুকুল দিয়েছি সঁপে
কণ্ঠে জড়িয়ে গানের লতা
প্রাচীন মমির যুগ থেকে তুলে আনা উপমার ফুল

সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে দুই হাত মেলে ডাকা...
যদিও ভাষায় তত স্বয়ংক্রিয়তা ছিল না
যদিও রোদের পায়ে নূপুর ছিল না
বোধের ঝনাৎকার থেকে কিছু বিশ্বাস পেয়ে
ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সদর্থক ক্রিয়া

সেই বিকেলের মূর্খরা শোনো
তপস্যা ভঙ্গ হয়ে গেলে
আবার ফিরল পৃথিবীতে আদিম দেবতার দল
আর নষ্ট কারমাইকেলে তাদের চাউনির নীল পরোয়ানা
মিলল রমণীদের ঘরে প্রবেশের
সঙ্গম প্রবহমান হল পৃথিবীতে

# আশ্চর্য সমাপতন
## মুস্তাফিজ রহমান

অচিনলিপিতে লেখা এই পাণ্ডুলিপি
আমি কিছুই বুঝিনি

এই কথা শুনে
টুপ করে ঝরে গেল
সৌদামিনী

# জলবন্ধু
## দেবাশিস সাহা

পাখিদের কোন সীমান্ত নেই
কোন কাঁটা তার নেই
বাতাসের জন্য

জল নিজের নিয়মে চলে
জলে খেলা করে
বেশ কিছু চরিত্রহীন মাছ

মাছ শিকারে যারা যায়
সেই সব জলবন্ধু
খেলাচ্ছলে পেরিয়ে যায় গণ্ডি

গণ্ডির দাগের যন্ত্রমানব
জলবন্ধুদের রেখে আসে
অন্ধ বিধবাদের হাতে

কূটনীতির চাঁদ
হাত ধরে পার করে দেয় অভিনন্দন কে

এপার-ওপারের জলবন্ধুদের বয়স
ক্রমশ বেড়ে যায় অন্ধকারে
তাদের বারোমেস্যা অমাবস্যায়
কোন চাঁদ আসে না।

# কালবৈশাখী রাঙামাটির পাড়ায়

**নাসিম এ আলম**

অতি দস্যুতা থেকে গড়িয়ে পড়ছে রোদ
বাদাম প্রিয়তা থেকে ভেঙে নিতে নিতে
সময়ের কাছে চেয়েছি শীতলতা, ডানা ঝাপটানো উল্লাস,
ঢালুপথ, নিম্নভূমির দিকে রাঙ্গামাটির পাড়ায় পাড়ায়
কতটা গভীর নীচে নেমে গেছে ঘরে ফেরার দিন

ভেবেছিলাম সহজ কবিতা সহজাত কালবৈশাখী এনে দেবে
সারাদিন ভ্যাপসা গুমোট, দিনের অস্তরাগে
দূর বাবলার প্রান্তে সমাপ্তি চেয়েছিল কেউ
চেয়েছিল অন্নজলে আরও গভীর হবে বেঁচে থাকা

যেহেতু জ্বলন্ত উনুন, জ্বলন্ত খিদের থেকে
স্বস্তি পেতে চায় কৃষক সমাজ, ধোঁয়া ওড়ে
উনুনে লাউশাক, প্রান্তভূমির লাল চাল, সামান্য রূপোলি মাছ
শিখা থেকে পবিত্র মেয়েরা রান্না চড়িয়েছে,

বর্ষা আসছে, ধান রোয়ানোর গালে অবধি কৃষি জীবন
তবুও অপেক্ষায় থাকতে হবে, ফিরে আসবে শালিক চড়ুই
ফিরে আসবে প্রবাসী জীবন শেষে গ্রামের সন্তান।

# মায়াবী উপগ্রহ

**আবু রাইহান**

আমি কি এখন গাছ হয়ে উঠছি
বিচরণের কথা ভাবলে কেন যে
এত ক্লান্ত লাগে
আমার দেহের ব্যবহৃত অঙ্গ পতঙ্গের মধ্যে
সারাক্ষণ লেগে থাকে ঘুমের ঘোর,
কতদিন দেখিনি পূব দিগন্তে ক্লান্তি জোড়ানো
মায়াবী ভোর !
গাছেদের মত অনন্ত সহিষ্ণুতার স্বভাব
আমার নয়
অন্তর্হিত হওয়ার কথা ভাবনাতে এলেই
জেগে ওঠে প্রবল ভয় !
চারপাশের শূন্যতার মাঝে
হে আমার মায়াবী উপগ্রহ
অনিঃশেষ হওয়ার আগে তোমার কাছে
চাইছি নিরাপদ আশ্রয় !

# অসম্ভবের কথা

**শ্রীজাতা কংসবণিক**

এখনো এখানে, ফুলের বাগান জুড়ে মায়া
ধানের বাগানে চাঁদ আর
জ্যোৎস্নায় ছায়া লেগে থাকে গ্রহণের...
এখনো গ্রহণ বলতে শুধু গিলে ফেলা চুল থেকে নখ
অথবা নিঃশব্দ বেদনা না...

এখানে জটিল কিছু নেই
এই ছায়াজন্মের কাছে
গ্রহণ মূলত এক ঋণ

জানিনা এখনো কেন, প্রয়োজন খুব বেশি নয়
বিঘা তিন জমি, তাতে বছরের ধান
আর মুখ গুঁজে সারাদিন চুপচাপ
ঘাসের উপরে মাথা
শিশুটিও জলপাড়ে হেসে খেলে
পার্থিব জটিল 'প্রয়োজন' ধুলোয় ওড়াবে
এটুকুই...
শুধু এটুকুই... ফুলের বাগানে থাক মায়া
মায়ার বাগানে আমি
আর সন্তানেরা...

## সবুজের কান্না
**নুরুল ইসলাম মিয়া**

কোরো নাকো ভুল মেরো না কুড়ুল
মোদের বক্ষে ভাই
এ সবুজ ভূমি হবে মরুভূমি
আর বুঝি দেরি নাই।

এ ধরার বুকে থাকি সুখে দুখে
মোরা বিধাতার দান
সবুজের সাজে সবুজের মাঝে
মোরা প্রকৃতির প্রাণ।

বাঁচাইতে আয়ু প্রাণদায়ী বায়ু
দিয়ে থাকে অবিরত
দিই ফলমূল কচি পাতা ফুল
সেবাই মোদের ব্রত।

এত মারো তবু রাগ নাই কভু
হাসি মুখে যাই ভুলে
মোরা প্রতিবার আঁচল ধরার
ভরে দিই ফলে ফুলে।

পাখি বাঁধে বাসা দিই ভালোবাসা
আছে বুক ভরা মায়া
প্রখর রৌদ্রে দগ্ধ চৈত্রে
মোরা পথিকের ছায়া।

তবু দেহ ফেড়ে প্রাণ নাও কেড়ে
বলো কিবা অপরাধ
কেন শত্রুতা কেন মত্ততা
হয়েছ কি উন্মাদ?

লয়ে হাতিয়ার কেটো নাকো আর
সকাল সন্ধ্যা রাতে
ওরে, এ সবুজ ভূমি হবে মরুভূমি
কুঠার থাকিলে হাতে।

## আমি সময়ের সুধাময় সুখ পুষে রাখি
**আব্দুস সামাদ**

এ ঘোর অসময়েরও বেঘোর পায়ে
তোর ভোগ-বিলাসের সুখে নিরুপায়ে
ফুল-ফলে ও ফলাহারে ভ'রে থাকে ফলকর।
অথচ সেই অসময়ের মাছরাঙা ঠোঁটে
কত দুস্তর পারাবারে আজো নাক খোঁটে
জলের শেকড়ে-বাকড়ে বেড়ে ওঠা জলকর।
তাই তার অবাক ইচ্ছার কাক-জোছনায় তোর
আঁধার ভ্যাঙছে মোরগের ডাকে হয় ব্যাঙাচি ভোর।
তবুও কি তোর তোড়জোড় হাওয়া লাগে কখনও কারও পালে?
নাকি তার নিখাঁজ ভাঁজ পড়ে কারও প্রতীক্ষার তিলক কপালে!

আমি সেই কারণেই খোদ এই সুদখোর সকালে
ফের কতো ঢের খাতকের খেলাপে বিভোর অকালে
ঘাতকের রাত-কালিতেই লিখি
কেবল-ই রোদমাখা দিনলিপি।

এভাবেই তোর হ'য়ে জলের তোড়ে
আমি খেলি জলকেলি। জল দিয়ে জলে
অবিকল জল লিখি। মাছ দিয়ে মাছ লিখি,
গাছ দিয়ে গাছ লিখি।
আর এভাবেই তোর হ'য়ে নির্ভয়ে
কতো অসময়ের অতিকায় আতিথ্যে
তোতে আমাতে বুক দিয়ে ভালোবাসা মাখামাখি
ক'রে আমি সময়ের সুধাময় সুখ পুষে রাখি।

## বেঁচে থাকা
**সঙ্গীতা চৌধুরী**

মৃত্যু অন্ধকার গুণতে গুণতেই... কেটে গেল কুড়িটা বছর।
স্নেহ নেই... নেই কোন ও ছাতার গল্প...
মৃত্যু আর অন্ধকার মিলিয়ে জীবন হয়ে গেল
অথচ এই আধখাবলা পোড় খাওয়া জীবনটাকেও কেউ কেউ হিংসা করে।

# তুমি এসো এসো কনক
**নির্ঝর চট্টোপাধ্যায়**

অনেক দিন পর এলো
কুয়াশা ভরা এই সকাল

সূর্যের দ্যাখা নেই আজ
ঠান্ডায় কাঁপে এই দেশ

তুমি এসো- এসো কনক

শুনেছি তোমার শরীরে এখন
ষোল বসন্তের জ্বলন্ত আগুন

সেই আগুন ছড়িয়ে দাও
সারা ঘরময় তুমি

তুমি এসো- এসো কনক

# একটিবার দেখতে পেলেই
**সামিম আখতার খান**

রঙিন রোদের ঢেউয়ে ভেসে আসে
মায়াবী ইচ্ছের স্বপ্নেরা।
নীলাভ আকাশের বুক চিরে
ভেসে যাওয়া মেঘের মতো
হৃদয় অলিন্দে ঘুরপাক খায়
একটিবার দেখার ইচ্ছে।

আমার নিদ্রাহীন চোখে লেগে আছে
অভিমান -অপেক্ষার দিনলিপি
শুধুই খুঁজে ফিরি, কেউ কোথাও নেই
প্লাবনের শব্দে শুনে এসে দাঁড়াই নির্জন বারান্দায়
উদাস বাউলের মতো বৃষ্টি মেখে ভিজে চলেছি
আমার প্রতিটি অশ্রুবিন্দুতে তার নাম লেখা।

লোক থেকে লোকান্তরে খুঁজে চলি
একটিবার দেখতে পেলেই...

# ধূপকাঠি
**সৈয়দ নুরুল ইসলাম**

ধূপকাঠি নীরবে দাহিয়া গন্ধ বিলায়
মৃদুমন্দ বাতাসে গন্ধ ছড়ায়ে সুবাসিত করে কুলায়।
জন্ম তব পঙ্কে, মিশ্রিত ভালো-মন্দ উপাদান
গুনেগুনান্বিত, প্রাপ্তি রাজ সম্মান।

সবারে পূজা দানে নিজে পূজা পাও
সহিষ্ণুতার প্রতীক বোবা বধিরে ভাষা দাও।
রাজা রানির রাজপ্রাসাদ হতে অসহায়ের জীর্ণ কুঠির
সাড়া দাও সেবার ধর্মে, পাশে থাকো সদা মৃত লাশের
ধনিক বণিকের নিত্য সাথি, কোথা হতে এগুন পেলে
জীবন মম ধন্য হত, তোমা হেন এগুন পেলে।

# ধর্ম শ্রেণী
**নাজমিরা সুলতানা সুমি**

ধর্ম! ধর্ম!
মানুষ হয়ে তোমার প্রধান কর্মই কি ধর্ম?
ধর্মে আছে কি উল্লেখ -
দাঙ্গা কর শুধু দাঙ্গা কর?
ধর্মকে ঘিরেই -!
কে মুসলিম কে হিন্দু নাইবা বিচার করলে তুমি।
মানুষ গো, মানুষ আমি, নয়কো কোনো  শাকচুন্নি।
না জানলে ধর্ম আমার
কি করে আমায় মারবে?
মানুষ তুমি, মানুষ হও
মানুষ ছাড়া হয় কি ধর্ম?

# পার্পল রঙের পাখি

**সুব্রত হাজরা**

বৃষ্টিরা আজকাল ভিজতে জানে না
দুষ্টুমির চোখে তাকিয়ে
রাত পার করার সুখ কতও দিন পায়নি
ওকে একটু করুণা ভিক্ষে করতে হবে।

শ্রাবণ বেশ নবীন।
হরিণ পায়ে সারাজীবন ছুটতে রাজি হয়ে
কার মধ্যমায় নদী খুঁজে চলে !

একা একা রৌদ্রে আকাশ ছুঁতে চাওয়া
আত্রেয়ী হওয়ার গোপন অভিলাষ
পার্পল রঙের পাখিতে
নষ্ট করে তুলেছে এ জীবন।

স্নাত হতে গিয়ে-
সে স্নাতকোত্তর হয়ে উঠল।

তবু
ভেজা তার আর হল না।

# স্মৃতি

**বিশ্বজিৎ মণ্ডল**

সদ্য খোঁড়া কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়াই—
এখানেই সতেরোটি বছর ধরে মাটি কুপিয়ে নির্মাণ করেছি
অনিবার্য অন্ধকার

প্রিয়তুতো আশয়গুলো তুলে রেখেছি— আমাদের
মধ্য যুগীয় বুক রাকে
আরো একবার ঠিকঠাক দেখে নিই, বিমুখ স্বজনের অবয়ব
অভিমানে ডুবে যাওয়া আমাদের প্রেমের অপরিণত নৌকা,
সোনাঝুরি তলায় ছিঁড়ে ফেলা প্রথম প্রেমপত্র

আজ আর রিবন অন্ধকার নেই....
দশক ফেরত পেঁচার মগডালের কান্না নেই
কেবল নেশাতুর বিকেল এলেই ইচ্ছে আঁকি
কবরের কফিন ঘুমে

# বিধ্বস্ত আমি

**সালমান মণ্ডল**

রক্তাক্ত মানবতার পরাজিত মুখে সজোরে করেছি পদাঘাত,
লক্ষাধিক ক্ষত বিক্ষত লাশ মাড়িয়ে বলেছি তোমায় সুপ্রভাত।
কোনো এক কুক্ষণে তুমি জয় করেছ আমার হৃদয় সালতানাত,
আমার স্নায়ুপথে উদ্ধত শিরে ছুটছে তোমার বিজয় রথ।

এ দুর্বল মননে অবিরত আছড়ে পড়ে তোমার নির্দয় হান্টার,
গড়িয়ে পড়া রক্ত ফোঁটা দু পায়ে পিষে বাড়াও তোমার পদভার
হাসিমাখা মুহূর্ত সব নিমেষে কাড়ে তোমার নির্মম আচার।
বিনিদ্র রজনী শেষে তোমার মুখাবয়ব এসে তিক্ত করে আহার।

অবিরাম উচ্ছলতার আড়ালে বেঁচে থাকার দিনগুলি করছি শোধ,
অকৃত্রিম ভালোবাসায় বেঁচে থাকো তুমি, ঘুমাক তোমার অবুঝ বোধ।
অনাবিল হাসির মুখোশে তোমার বিরক্তির রাজ্য হতে হব কারাবরোধ,
আমার অন্তে উল্লাসে মুষ্টিবদ্ধ করো তোমার হাত, এ আমার শেষ অনুরোধ।

# এই বৈশাখে তোমার কথা

**ফারুক আহমেদ**

যে স্বপ্নে তুমি নেই
সেই স্বপ্ন কোনও স্বপ্নই নয়
যে বেদনায় তুমি নেই
সেই বেদনা কোনও বেদনাই নয়
যে আনন্দে তুমি নেই
সেই আনন্দ কোনও আনন্দই নয়
যে দেখায় তুমি নেই
সেই দেখা কোনও দেখাই নয়
যে আদরে তুমি নেই
সেই আদর কোনও আদরই নয়
যে ভালবাসায় তুমি নেই
সেই ভালোবাসা কোন ভালবাসাই নয়

# ঘিরছে কালো

**আসাদ আলী**

এই ত' এত সফেদ ফেনা
লক্ষ ঢেউয়ের মাথায় চড়ে
যাচ্ছে কোথায় কেমন করে
তাকিয়ে থাকি; নীচেতে নীল
চারিদিকে যে দিকে চাই
বেলাভূমির সোনার বুকে
ধাক্কা মারে ক্ষণে ক্ষণে
আপন মনে। কেন যে কেবা জানে
এর কি মানে।
তার বুকেতে ছেঁড়া ছেঁড়া
মেঘের ভেলা যাচ্ছে ভেসে
দিগন্তের ঐ মিলন রেখায়
সূয্যি মামা ডুবতে শেখায়
অদ্ভুদ ওই সোনার মায়া
এই ভুবনে চাই দেখতে জানা
মাথা উঁচু করতে জানা
ধীরে ধীরে ঘিরছে কালো
আঁধার ছায়া (ছাওয়া?) এই পৃথিবীর

# রঙবেরঙের প্রশ্ন

**আমিনুর রাজ্জাক দফাদার**

সব আলো সব সময় অন্ধকার ঢাকতে পারে না
মৃত্যু যদি কালো তবে মানুষ কেন
আলোক সন্ধানী-?

আগুন ঝরা আকাশ
ক্ষ্যাপা নদীর স্রোত
রক্ত রাঙামাটি -!
ফাগুনে ফোটেনি ফুল -
জীবনের রঙে মেতেছে সবাই -

ঘুমের সিঁথিতে সিঁদুর
জড়ো হয় রঙবেরঙের প্রশ্ন!
এবার আষাঢ়কে ডাক দাও
ডাক দাও সুপার সাইক্লোনকে
পাখিদের সেই হারিয়ে যাওয়া সুর
ফিরে আয়- ফিরে আয়
তোরা বসন্তের সুগন্ধি ফুল -!

ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন মাঝে- আবারও রঙবেরঙের প্রশ্ন!

## একটু স্মৃতি
**মুরারি**

স্মৃতিগুলো ঝাপসা হলেও একটু আধটু পড়ে মনে।
কচুর পাতায় জলের নাচন ছোট্ট বেলার নাচের ছলে।।
নাচ্ নয়ত লেংটু সবাই দশ-বিশ জন বন্ধু মিলে।
বৃষ্টি পড়া জলের তালে কচুর পাতা মাথায় তুলে।।
কত রকম ঠ্যাং তোলা আর হাত ঘোরানো নাচ্ দেখিয়ে।
ঝুপ করে ঝাপ দিতাম সবে ছোট্ট নদীর ঘোলা জলে।।
বাড়ির থেকে লাঠি হাতে আসত যখন বাবা কাকা।
দু'চোখ সবে লাল হয়েছে ঘোলা জলের লেগে ফিকা।।
বা হাতেতে কানটি ধরা ডান হাতেতে কঞ্চি শাসাই।
দৌড়ে এসে ঠাকমা তখন আঁচল দিয়ে আমার ঠেকাই।।
সেসব স্মৃতি মনে হলে দু'চোখ ভরে ওঠে জলে।
হায়রে মধুর দিনগুলো সব আর কি পাব কোন কালে।।

## গোধূলিতে আধুলিতে
**আশা ফিরদৌসী**

তুমি অতো হন্য হয়ে
কত কী যে খুঁজেছিলে
ওই সাঁঝের খাঁজের
রাঙা গোধূলিতে।
তবু তুমি ধন্য হ'য়ে
ততো কিছু পেয়েছিলে
তার ভাঁজের মাঝের
ভাঙা আধুলিতে?

## প্রতীক্ষায়
**যোগেন বিশ্বাস**

রাতগুলো ভোর হয়
নীরব নির্ঘুমে,
প্রভাত নিশি হয়
শত-কলতানে !

অনর্থ অর্থগুলো
কাটে মূল্যহীনে,
যাতনা অ-ব্যক্ত
তীব্র হাহাকারে !

সহস্র বৈভব
চিত্ত অভিলাষে--
হেলায় হারায় দিন
ব্যর্থ পরিহাসে !

পিপাসা আকণ্ঠ
মেটে প্রতীক্ষায়,
অ-ব্যক্ত কথাগুলো
প্রগাঢ় তমসায় !

## দাগ
**এবাদুল হক**

আমার মনের মধ্যে এত জেব্রা ক্রসিং দাগ
ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত বুক; তবুও নিশ্চুপ
শব্দেরা বুলেটে বুক পেতে দেয়
রক্ত-জবা হয়ে ওঠে সমস্ত বিদ্রুপ।

আমার মায়ের গোঁড়ালি থেকে তখনও
সোঁদা সিঁদুরের মেহগনি সুবাস
লাল ডুরে শাড়ি কপালে তার
আঁকা হয়ে গেছে জঙ্গল মহলের দ্রুম।

হেমন্তের রৌদ্রোজ্জ্বল আলোয়
মা আমার বেরিয়েছিল মেয়ে বাড়ি
ঘুরে আসা হয় নি; জঙ্গল মহলের হার্মাদ
কেড়ে নিয়েছে আমার মায়ের শ্বাস।

দেশময় এত হৈ চৈ নানা সতর্ক বার্তা
অথচ জঙ্গল মহল এত শুনশান কেন?

বর্তমান সময়ে সব থেকে বড় যে সমস্যার মুখে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, তা হল পরিবেশের প্রতি মানুষের দুর্ব্যবহার ও বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণ। প্রকৃতি আর কত সহ্য করবে। এবারে শুরু হয়েছে প্রত্যাঘাত। সাম্প্রতিক কেরল ও বিহারে অসময়ে বন্যা, পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টি এবং উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতে ভূমিকম্প হল তারই কিছু নিদর্শন। তাই আজ আমাদের আশু কর্তব্য প্রকৃতি ও পরিবেশ কে বাঁচানো।

বেলডাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতি তাই পরিবেশের প্রতি কর্তব্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বৃক্ষরোপণ, সবুজায়ন এবং জল সংরক্ষণ আমাদের লক্ষ্য আগামী দিনগুলিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "সেভ গ্রীন স্টে ক্লিন" কর্মসূচি আমাদের সামনে রেখে এগিয়ে চলেছি। সকলের কাছে এই প্রার্থনা যে এই দ্বায়িত্ব সকলকেই কাঁধে তুলে নিতে হবে। তবেই এই সুন্দর পৃথিবী হয়ে উঠবে বাসযোগ্য।

আগামী দিনগুলি আনন্দমুখর হয়ে উঠুক সকলের। সকলের মঙ্গল কামনা করি আমরা।

বিরূপাক্ষ মিত্র
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
বেলডাঙ্গা-১ উন্নয়ন সমষ্টি

নজরুল ইসলাম
সভাপতি
বেলডাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতি

# ১ নং ওয়ার্ড

## বেলডাঙ্গা পৌরসভা, মুর্শিদাবাদ

**উন্নয়নের পথে মানুষের পাশে**

সৌজন্যে - **তাহামিনা বিবি** (কাউন্সিলার)

১নং ওয়ার্ড, বেলডাঙ্গা পৌরসভা, মুর্শিদাবাদ